ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ।। ২৯ ফাল্গুন, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১৪ মার্চ ২০১১ ।। Website : www.eswastika.com

ইমামদের ভাতা প্রদান

ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ দত্ত।। দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে মুসলমান তোষণকারী ভারত সরকার গত কয়েক দশক ধরে তিন লক্ষ ইমামকে সরকারি কোষাগার থেকে ওয়াকফ্ বোর্ডের মাধ্যমে মাইনে দিচ্ছে, এই সাথে "The Telegraph" পত্রিকার ১৯৯৬ সালের ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত একটা সংবাদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "Imams challange" : The Supreme Court will hear a petition next monday filled by All India

organisation of Imams over a central violating of 1993 scale of pay over three laks of Imams. দিল্লী ও হরিয়ানা অঞ্চলে ইমামরা প্রতিমাসে ৫০০০ টাকা মাইনে পাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্য কিছু রাজ্যে ইমামরা এর চেয়ে কম মাইনে পাচ্ছে। এই বেতন বৈষম্যের প্রতিবাদে ইমামরা সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা দায়ের করে, তাতে ১৯৯৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট বলেন "ইমামদের পদমর্যাদা একজন প্রথম শ্রেণীর অফিসারের সমান হওয়া উচিত। ন্যূনতম বেতনও হওয়া উচিত অন্তত পাঁচ হাজার টাকা," এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বৃহত্তর ইমাম সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ্ ইমাম অফ্ মস্ক'-এর সভাপতি ইমাম উমের আহমেদ ইলিয়াশি (যার আওতায় রয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ইমাম) বলেন "বর্তমানে এই বেতন কমপক্ষে ২৫ হাজার টাকা হওয়া উচিত।" এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য মোয়াজ্জিন যারা শুধু মসজিদে আজান দেন। পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন ভোটের কথা চিন্তা করে সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে প্রচণ্ড কামড়া কামড়ি শুরু হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯-এর এক সংবাদে প্রকাশ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইমামদের বেতন বৃদ্ধির

(এরপর ৪ পাতায়)

দেওয়াল লিখন পড়ুন বুদ্ধবাবুরা

রক্তের হোলি খেলে ভোটে জেতার দিন শেষ

গূঢ় পুরুষ।। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের সময়সূচী ঘোষিত হয়েছে। নজিরবিহীনভাবে এই প্রথম রাজ্যে ছয় দফায় ভোট গ্রহণ করা হবে। এতটা দীর্ঘ সময় ধরে ভোট প্রক্রিয়া চললে শুধু যে সরকারি প্রশাসন অচল হবে তাই নয় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। নির্বাচন কমিশনও এই অসুবিধার কথা জানে। কিন্তু কমিশনের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার এতটাই অবনতি হয়েছে যে রক্তক্ষয়ী ভোট রুখতে রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। পুরোদস্তুর কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করেই এবার ভোট গ্রহণ করা হবে। এই কারণেই ছয় দফায় ভোট করতে হচ্ছে। অন্য কথায়, বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসন ও পুলিশের উপর নির্বাচন কমিশনের আস্থা নেই সেই কথাটাই ঠারেঠোরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সিপিএম দলের রাজ্য নেতৃত্ব ছয় দফায় ভোটের মধ্যে ষড়যন্ত্র দেখছেন। বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যদের মতে এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটা হাওয়া তোলা যাতে রাজ্যবাসীর মনে হয় এবার বামফ্রন্ট সরকারের বদল হচ্ছে। বিমানবাবু বলেছেন, সেই ২০০১ সালের নির্বাচনের সময় থেকেই এমন হাওয়া তোলা চলেছে। লাভ হয়নি। ২০০১ এবং ২০০৬ সালের বিধানসভার নির্বাচনে বামফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরেছে। 'পাল্টে দাও', 'বদলে দাও', 'পরিবর্তন চাই' এইসব শ্লোগানে মানুষকে প্রভাবিত করা যায় না।

যৌথবাহিনীর টহল।

এবারেও নির্বাচনে বামফ্রন্ট পূর্ণ গরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরবে।

একথা সত্যি যে বিগত দু'টি বিধানসভা নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের যথেষ্ট হাওয়া ছিল। কিন্তু সেই হাওয়ার প্রতিফলন ব্যালটে দেখা যায়নি। এর জন্য তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য কংগ্রেসের কয়েকজন 'তরমুজ' নেতার দু'মুখো নীতি দায়ী ছিল। সিপিএম নেতৃত্ব স্বীকার করুন বা নাই করুন রাজ্যের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন চাইছেন। এই পরিবর্তন চাওয়াটা সেই ২০০১ সালের নির্বাচনের সময়ে ছিল। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না। তার কারণ, মমতার খামখেয়ালি আচরণ এবং প্রদেশ কংগ্রেসের তরমুজ নেতাদের প্রতি অবিশ্বাস অনাস্থা সেই চাওয়াটাকে বাস্তবায়িত করতে দেয়নি।

এবার নিঃসন্দেহে পরিস্থিতির বদল হয়েছে। গত এক দশকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক আচরণ অনেকটাই পরিণত হয়েছে। তিনি কংগ্রেসের তরমুজদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করেছেন। নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে তিনি যথেচ্ছভাবে রেলমন্ত্রককে ব্যবহার করছেন। দিল্লিতে সাংবাদিকরা তাঁকে 'বাংলার রেলমন্ত্রী' বলেন। মমতার লক্ষ্য, মহাকরণ দখল। সেই লক্ষ্যে কী তিনি এবার পৌঁছবেন? নির্দিষ্ট জবাব দেওয়ার সময় এখনও আসেনি। তবে এমন সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। হাটে-বাজারে, ট্রামে-বাসে মানুষ একমত যে, এবার নতুনদের আনা হোক। যদি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে না পারে তবে পরের নির্বাচনে তাদেরও বদল হবে। 'পরিবর্তন'

(এরপর ৪ পাতায়)

'গেমস্ লীগ্যাসি রিপোর্ট'-এ কালমাদি-ই নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা।। কমনওয়েলথ গেমস্ (৩-১৪ অক্টোবর, ২০১০) সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণসহ পঞ্চাশ মিনিটের এক তথ্যচিত্র তৈরি করা হয়েছে। সেখানে গেমস্ আয়োজন সমিতি'র বরখাস্ত চেয়ারম্যান সুরেশ কালমাদির নামের কোনও উল্লেখ

সুরেশ কালমাদি

পর্যন্ত করা হয়নি। এই রিপোর্টের শিরোনাম —'গেমস্ লীগ্যাসি রিপোর্ট'। ডিজিট্যাল তথ্য-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে 'প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যম'-এর সাহায্যে এই বিবরণ তৈরি হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে সুরেশ কালমাদিকে বাঁচাতেই অত্যন্ত সন্তর্পণে এই বিবরণমূলক তথ্যচিত্রের

(এরপর ৪ পাতায়)

আদালতের রায়

গোধরা-গণহত্যা একটি পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গুজরাটের গোধরায় করসেবকদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনায় আদালতের রায়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক ডাঃ প্রবীণভাই টোগাড়িয়া। এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, ৯৪ জন অভিযুক্তের মাত্র ৩১ জনকে সাজা। এটা ঠিক নয়। রাজ্য সরকারের সত্বর হাইকোর্টে আপীল করা উচিৎ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দাবী সকল অভিযুক্তকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত ওইসব অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ অবধি পুড়িয়ে মারা নির্দোষ লোকেদের এবং তাদের আত্মীয় পরিজনদের প্রতি সুবিচার করা হবে না। ডাঃ তোগাড়িয়া অবশ্য আদালতের একটি সিদ্ধান্তের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন— "গোধরা- গণহত্যা এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।"

ডাঃ তোগাড়িয়া সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলেই প্রধান অভিযুক্ত মৌলবী মৌলানা হুসেন উমরজী,মহম্মদ হুসেন কলোটা সহ অন্য ৬৩ জনকে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন জেহাদি-চক্রান্তকারীদের বাঁচানোর জন্যই 'ব্যানার্জী কমিশন' গঠন করা হয়েছিল এবং কমিশন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে রিপোর্ট দিয়েছিল— আগুন বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকেই লেগেছিল।

সবরমতী এক্সপ্রেসের দগ্ধ এস-৬ কামরা থেকে মৃতদেহ বার করা হচ্ছে। (ফাইল চিত্র)

প্রসঙ্গত, লালুপ্রসাদ যাদব রেলমন্ত্রী থাকাকালীন রেলের তরফে ব্যানার্জী কমিশন গঠন করা হয়েছিল।

গোধরা স্টেশনে নিরীহ ধর্মপ্রাণ করসেবকদের নারী-পুরুষ-শিশুসহ ৫৯ জনকে গত ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে অমানুষিক ভাবে সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সেই মামলায় আদালতে ৯৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তারমধ্যে মাত্র ৩১ জনকে গত ২২ ফেব্রুয়ারি দোষী সাব্যস্ত করে। ১ মার্চ সাজা দেওয়া হয় ১১ জনকে ফাঁসি এবং কুড়ি জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। প্রায় বারো বছর বাদে রায়।

বিচারপতি পি আর প্যাটেল তাঁর প্রদত্ত ৮৫০ পৃষ্ঠার রায়ে বলেছেন, সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরায় আগুন লাগিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারাটা পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এজন্য মোট ১৫৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছিল। ১৬ জন ফেরার এবং পাঁচজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। ৯৪ বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলে।

মূল ষড়যন্ত্রকারী মৌলবী হুসেন হাজী ইব্রাহিম উমরজী এবং মহম্মদ হুসেন আব্দুল রহিম কালোটা ঘটনায় যুক্ত থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বলে মাননীয় বিচারপতি জানিয়েছেন। বেকসুর খালাস পাওয়া সবাইকে ব্যক্তিগত দশহাজার টাকার বণ্ডে মুচলেখা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ছ'মাস পর্যন্ত আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে যেতে বারণ করা হয়েছে। ২০০৯-এর জুন মাসে কড়া নিরাপত্তায় সবরমতী জেলেই শুনানী শুরু হয়েছিল।

(এরপর ৪ পাতায়)

আসছে স্বস্তিকা'য় 'পরিবর্তন' আসছে.. নজর রাখুন

সম্মুখ সমরে দুই শিবির ঃ অশান্তি অনিবার্য

নিশাকর সোম

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়েছে। সকল দলেই প্রাথমিক প্রস্তুতি— অর্থাৎ প্রার্থী বাছাই চলছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা আতঙ্ক দেখা যাচ্ছে। তাঁদের ধারণা-এবার এলাকা দখল, বে-দখল এবং পুনর্দখলের জন্য পেশী শক্তির ছড়াছড়ি দেখা যাবে। রাজ্যের দু'টি যুযুধান গোষ্ঠীর এ-ব্যাপারে তো রেকর্ড রয়েছেই। নন্দীগ্রাম থেকে নেতাই, সিঙ্গুর থেকে জঙ্গলমহল— এসব ব্যাপারে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে এ-রাজ্যে। এখন এই দুই যুযুধান গোষ্ঠীর নেতা-নেত্রীদের 'শান্তিতে ভোট হোক এবং শান্তিতে ভোট দিন' কথা শুনলে মনে হয়— 'বিড়াল মাছ ছোঁবে না, বৃন্দাবনে যাবে?' এই দুই গোষ্ঠীর নেতাদের হিপোক্রেসি দেখার মতো। তাঁরা মুখে শান্তির কথা বলছেন— তলায় তলায় অশান্তির প্রস্তুতি চলছে। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে ততই পেশী শক্তির প্রদর্শনী বাড়বে না কি? নির্বাচনের দিনগুলিতে কি হতে যাচ্ছে— সে ব্যাপারে সবাই উদ্বিগ্ন।

এদিকে দুই শিবিরে বর্তমান অবস্থার দিকে একটু পর্যবেক্ষণ করা যাক। প্রথমে দেখা যাক শাসক গোষ্ঠীর অবস্থা— বামফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে সিপিএম-এর 'দাদাগিরি' এবং 'সিট না ছাড়ার' ও তাদের প্রতি সহানুভূতির অভাবের জন্য ক্ষোভ এখনও স্তিমিত হয়ে যায়নি। এই ক্ষোভ নিয়েই প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হবে। ফলে নিচের তলায় বামপন্থীদের সিপিএম-বিরোধী মনোভাব ফল্গু-নদীর মতো বইতে থাকবে। এর প্রতিফলন ভোটের বাক্সে কি পড়বে না? যদিও সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব এ-বিষয়ে পূর্বেই জ্ঞাত হয়েছেন। চেষ্টা করেছেন— ক্ষোভ কমিয়ে বিরোধী দলের দিকে ক্রোধ জাগাতে।

এই সঙ্গেই বলা যায় বামফ্রন্টের প্রধান চারটি দলে অর্থাৎ সিপিএম, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি-এর মধ্যে দড়ি টানাটানি এখনও চলছে।

সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত হয়েছে— (১) জেতা প্রার্থীরা প্রায় সকলেই মনোনয়ন পাবেন। অসুস্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত, কাজ-ভাল না করার জন্য বেশ কয়েকজন মনোনয়ন পাবেন না। এর মধ্যে উল্লেখ করা যায়— বরানগর-নিবাসী নদীয়া থেকে নির্বাচিত আইন মন্ত্রী রবিলাল মৈত্র-কে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে সিপিএম- রাজ্য নেতৃত্ব মোটামুটি মনস্থির করে ফেলেছেন বলে জানা যাচ্ছে। অসুস্থ মন্ত্রী শৈলেন সরকার নিজে দাঁড়াতে চাইলেও রাজ্য-নেতৃত্ব কিন্তু তাঁকে নিরস্ত করছেন। (২) রাজ্য-নেতৃত্ব যুবকর্মী ও মহিলা- কর্মীদের অগ্রাধিকার দিতে চান— তাই তো সল্টলেকে এবং রাজদেও গোয়ালার স্থলে যুব নেতারা প্রার্থী হবেন।

দুই গোষ্ঠীর নেতাদের হিপোক্রেসি দেখার মতো। তাঁরা মুখে শান্তির কথা বলছেন— তলায় তলায় অশান্তির প্রস্তুতি চলছে। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে ততই পেশী শক্তির প্রদর্শনী বাড়বে না কি? নির্বাচনের দিনগুলিতে কি হতে যাচ্ছে— সে ব্যাপারে সবাই উদ্বিগ্ন।

এ ব্যাপারে সিপিআই দলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সব থেকে ভাল। সিপিএম তাদের দাবি মেনে বেশি কেন্দ্রে প্রার্থী দিতে না-দেওয়াতে ক্ষোভ থেকে গেছে। এই দলের নেতা-মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য প্রার্থী হবেন না। সিপি আই-এর কলকাতা জেলার কোনও নেতাকে ভোটে দাঁড় করানোর চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে সিপিআই-এর ট্রেড ইউনিয়ন নেতা রণজিৎ গুহ-কে প্রার্থী করা হতে পারে।

পার্টির অভ্যন্তরীণ গোলমাল সব থেকে বেশি ফরওয়ার্ড ব্লকে, সেখানে কেউই পদ ছাড়তে রাজি নন। এরকম প্রতিকূল রাজনৈতিক আবহাওয়াতেও দাঁড়াবার প্রার্থী বহু। এর কারণ কি কোনও বিরোধী দলের উৎসাহ দান। সিপিএম-নেতৃত্ব ফরওয়ার্ড ব্লকের বাড়তি দাবি মানেননি। ফলে ফরওয়ার্ড ব্লকের মহীরুহসম নেতা অশোক ঘোষ ব্যতিব্যস্ত। ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী- নেতা রবীন ঘোষ-কে মনোনয়ন দিতে চান না নেতৃত্ব, তাঁর অসুস্থতার কারণে। রবীনবাবু প্রার্থী হলে সিপিএম সর্বশক্তি দিয়ে তার পেছনে লাগবেই। রবীনবাবু এমনকী সিপিএম-এর বিরুদ্ধে চেয়ারে বসে রেললাইন অবরোধে বসে গেছলেন এবং সিপিএম-এর সাংসদ হান্নান মোল্লার পরাজয়-এ নাকি তাঁর ভূমিকা ছিল বলে সিপিএম-এর প্রচার ছিল। তবে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব সিপিএম-এর সঙ্গে মানিয়ে নেবেন। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের নিচের তলার কর্মীরা সিপিএম-এর বিরুদ্ধে ভোট দেবেনই। ভুলে গেলে চলবে না ফরওয়ার্ড ব্লকে নেতা মমতাকে 'আমাদের নেত্রী' বলেছিলেন।

আর এস পি দলের সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তি হলেন ক্ষিতি গোস্বামী। একথা শোনা যাচ্ছে তিনি কলকাতার বাইরে প্রার্থী হবেন— আবার বরানগর কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক তো অসুস্থ এবং দৃষ্টিশক্তির অসুবিধায় ভুগছেন। সেখানেও ক্ষিতি গোস্বামী প্রার্থী হবেন কি? প্রশ্ন এই জন্য এবারে বরানগর পৌরসভা দখল করেছে তৃণমূল। সিপিএমের সঙ্গে আর এস পি-র সিট নিয়ে দড়ি টানাটানি শেষ হয়নি। পূর্ব কলকাতায় আর এস পি সমর্থকগণ বরাবর সিপিএম-বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকেন। এর ব্যতিক্রম কি হবে? শেষ খবর আলিপুরদুয়ারে ক্ষিতিবাবু দাঁড়াতে পারেন। ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি-এর নেতাদের এখন ঘোর অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে নাকি?

এতদসত্ত্বেও সি পি এম-এর রাজ্য-নেতৃত্ব ফরওয়ার্ড ব্লকের মহীরুহ নেতা অশোক ঘোষকে 'ম্যানেজ' করার জন্য চেষ্টা চালাবেন। ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সিপিএম এক হয়ে সিপিআই-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত অন্য শরিকদের মানাতে সক্ষম হবে।

এবার একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক। ক্ষমতায় আসার জন্য যে-জোট উঠে পড়ে লেগেছে— সে জোট হলো তৃণমূল— কংগ্রেস। এখানে একটা কথা পরিষ্কার বুঝতে হবে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশ মাথা পেতে নেবেন তিনটি কারণে ঃ (১) এ-রাজ্যে তৃণমূলই প্রধান বিরোধী শক্তি এবং লোকসভার কংগ্রেসের পরই অন্যতম বৃহৎ গোষ্ঠী। (২) দুর্নীতিগ্রস্ত ইউ পি এ সরকার নিমজ্জমান— তাই তৃণমূলকে ধরে ভাসার চেষ্টা। অতএব, তৃণমূল কড়ায়-গণ্ডায় সুবিধা নেবেই। (৩) সর্বোপরি তামিলনাড়ুতে নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব আতঙ্কে রয়েছেন। তাঁদের আতঙ্ক সত্যে পরিণত হলে ইউ পি এ সরকারের আয়ু ২০১৪ পর্যন্ত কি গড়াতে পারবে?

এই পরিপেক্ষিতে এ-রাজ্যে তৃণমূলের শর্তেই কংগ্রেসে রাজি হবে, যতই দীপা দাসমুন্সি গলা ফাটাক। কংগ্রেস-কে এ-রাজ্যে ৫০-৫৫ সিট নিয়ে মাথা নত করে মানতে হবেই।

এর ফলে নির্বাচনে দাঁড়াতে ইচ্ছুক বহু কংগ্রেসি বিফল মনোরথ হয়ে তলায় তলায় জোট-বিরোধিতা করবেন— এমনও অবস্থা বাতিল করে দেওয়া যায় না যে এর মধ্যে সামান্য অংশ হলেও বিজেপি-এর দিকে ঝুঁকতে পারেন।

তৃণমূলের মধ্যেও কিছু অভিলাষী প্রার্থী হতাশ হবেন। তাঁরাও তলায় তলায় সিপিএম-কে মদত দেবেন— সিপিএম ও তাঁদের 'ভবিষ্যতে আশা পূরণ করে দেবার' প্রতিশ্রুতি দেবেই।

তৃণমূল নেত্রী ইতিমধ্যেই হরিদাস মিত্র- বেলা মিত্রের পুত্র ডঃ অমিত মিত্র-কে প্রার্থী করতে চলেছেন। প্রার্থী হওয়ার তালিকায় নেত্রী তাঁর অঘোষিত মুখপত্রের সাংবাদিক-মালিকদেরও প্রার্থী করতে চান। কিন্তু তাঁরা ব্যবসা ছাড়া আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

সর্বোপরি নেত্রীর নির্বাচনে না-দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত সিপিএম-কে প্রচারের 'ইস্যু' করে দিয়েছে। নেত্রী আবার বিধান পরিষদ পুনরুজ্জীবিত করে পরোক্ষ নির্বাচনে আসতে চাওয়াতে 'নেত্রী জনগণের ভোটকে ভয় পাচ্ছেন'— এই প্রচারও হবে। সব থেকে ভাল অবস্থায় আছে রাজ্য বিজেপি— তাঁরা এগিয়ে যাবেনই।

আর এস এস প্রতিনিধি দলের চীন সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন মুখপাত্র রাম মাধবের নেতৃত্বে তিন সদস্যের সঙ্ঘ কার্যকর্তাদের এক গোষ্ঠী সম্প্রতি চীন সফর করে এসেছেন। চীনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এন জি ও) 'চাইনিজ এসোসিয়েশন ফর ইন্টারন্যাশানাল ফ্রেণ্ডশিপ অ্যাণ্ড কো-অপারেশন'-এর কাছ থেকেই চীন সফরের আহ্বান এসেছিল। উদ্দেশ্য— চীন ও ভারতবর্ষ, এই দুই দেশের মধ্যে বিগত সময়ে যে বিরাট ফাঁক তৈরি হয়েছে তা কমিয়ে আনা। সঙ্ঘের প্রতিনিধিদলের অন্য দু'জন ছিলেন বিশ্ব বিভাগের সংযোজক শ্যাম পরাণ্ডে এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক সুনীল আম্বেকর। গত ২২ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁরা চীনে ভ্রমণ করেন। চীনের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রাজধানী বেজিং ছাড়া তারা জনান এবং সাংহাই-তে গিয়েছিলেন। সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চিন্তাবিদ এবং মিডিয়ার ক্ষেত্রে কর্মরতদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'মতামত বিনিময়' করেন।

আর এস এস-এর পক্ষ থেকে চীন সফরের আহ্বান গ্রহণ করার কারণ হিসেবে রাম মাধব জানিয়েছেন, 'চীন দেশ সম্পর্কে সঙ্ঘের নির্দিষ্ট মতামত রয়েছে যা সমালোচনামূলক। সেই মতামত ব্যক্তি-ব্যক্তি পৌঁছে দেবার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি।' প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকরির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সম্প্রতি চীন সরকারের আহ্বানে সেদেশ ঘুরে এসেছেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

গোধরার-হত্যাকাণ্ড পূর্বপরিকল্পিত

তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও তাদের লালিত পালিত সংবাদপত্র-পত্রিকা এবং টি.ভি. চ্যানেলগুলির লাগাতার প্রচারের ফলে গোধরা হত্যাকাণ্ডে হিন্দু অযোধ্যা-ফেরৎ হিন্দু পুণ্যার্থীদের কথা অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। তথাকথিত ধর্মানিরপেক্ষবাদীগণ আসলে কেবল মুসলিম তোষণকারী নয়, তাহারা হিন্দু বিদ্বেষীও বটে। তাহা না হইলে অযোধ্যার রামমন্দির দর্শন করিয়া ফেরৎ আসা একদল পুণ্যার্থীকে জঘন্য বর্বরভাবে ট্রেনের মধ্যে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া পেট্রল-ডিজেল ঢালিয়া পোড়াইয়া মারার পরেও এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মনে কোনও তাপ-উত্তাপ দেখা যায় নাই। দরদ বা ক্ষোভ থাকাতো দূরের কথা।

সেই বিস্মৃত দিনটির কথাও আমাদের স্মরণ করা উচিৎ। সেদিনের সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরায় ছিলেন নারী-পুরুষ শিশুসহ ৫৯ জন পুণ্যাত্মা। দিনটি ছিল ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। ভোরবেলা গোধরা স্টেশন ছাড়িবার পরেই কেউ বা কাহারা পূর্বপরিকল্পিতভাবে ট্রেনটিকে থামাইয়া দেয়। স্থানটি ছিল মুসলিম অধ্যুষিত ঘিঞ্জি বস্তি। হঠাৎই একদল উন্মত্ত হিন্দু-বিদ্বেষী সন্ত্রাসবাদী মুসলমান এস-৬ নম্বর কামরাটির দরজা জানালা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। প্রথমে ঝাঁকে ঝাঁকে পাথর ছুঁড়িয়া, পরে লাঠি ও লোহার রড দিয়া জানালার, কাঁচ ভাঙ্গিয়া কামরার মধ্যে গ্যালন-গ্যালন পেট্রল ঢালিয়া দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় সেই অমানুষিক কাজটি। পেট্রলে আহুতি দেওয়া হয় আগুন; পেট্রল-বোমার মাধ্যমে। সেই মানুষগুলি কী তাহা ভাবিলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

পুরো ঘটনাটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত গণহত্যা। নানান তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া আজ ইহা নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে যে সেদিনের সেই পূর্ব পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিল এমনকী স্টেশনে উপস্থিত ভেন্ডররাও। উন্মত্ত সেই জনতাকে যে পরিকল্পনা মাফিক সেদিন জড়ো করা হইয়াছিল তাহাও আজ প্রমাণিত সত্য। সেই জনতার মধ্যে সেই দিন উপস্থিত ছিলেন সেইসব মোল্লা-মৌলবীর দল যাহাদের চিহ্নিত করাও হইয়াছিল।

এই বর্বরতার বিরুদ্ধে গর্জিয়া ওঠা কী অপরাধ? নিজ ধর্মের উপর আক্রমণের জবাব দিতে গিয়া স্বধর্মের রক্ষায় নিজ প্রাণদান তো গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের-ই নির্দেশ। ''স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ''। গুজরাটের জনগণ দ্বারা বিপুলভাবে নির্বাচিত বিজেপি সরকারকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য যাহারা দাবি করিয়াছিল, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেস-বাম নেতারা এখন কী বলিবেন? রাজনীতিবিদগণতো নির্লজ্জ, তাই তাহাদের আজও লজ্জা নাই। সেই হিন্দু-বিদ্বেষী মমতা আজ পরিবর্তনকামী। কিসের পরিবর্তন? আবার হিন্দু-নিধন? বা হতভাগ্য হিন্দু তীর্থযাত্রীদের প্রতি যিনি কোনও মমতা দেখান নাই, সেই মমতার পরিবর্তনের ডাকে কী হিন্দুদের সাড়া দেওয়া উচিৎ?

সেদিনের সেই মুসলিম বর্বরতা আজ আদালতে প্রমাণিত। ইহাও প্রমাণিত যে সেই বর্বরতা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। কিন্তু অমানবিক গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় যদি সাময়িক চিত্ত-চাঞ্চল্য হিন্দুদের মধ্যে দেখাও যায় তাহা কি অস্বাভাবিক? হ্যাঁ, সেদিনের সেই নৃশংসতার প্রতিক্রিয়ায় নিশ্চতভাবে কিছু পাল্টা নৃশংসতা দেখা গিয়াছিল। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম তোষণকারী সেই রাজনীতিগণ গোধরা হত্যাকাণ্ডে নিহত ধর্মপ্রাণ মানুষগুলির প্রতি সামান্য দরদ যদি দেখাইতেন তাহা হইলে সহনশীল উদার হিন্দু জনগোষ্ঠী কিছুতেই এতটা ক্ষুব্ধ হইতেন না, এটা নিশ্চিত করিয়াই বলা যায়। একটু নিরপেক্ষ অরাজনৈতিক, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি সেদিন প্রয়োজন ছিল। কোনও রাজনৈতিক দল, সংগঠন, সংবাদপত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য গণমাধ্যম সেদিন হিন্দুদের প্রতি একটুও দরদ দেখায় নাই। কারণ হিন্দু যে সম্প্রদায়গত শিক্ষা দিতে পারিবে? হিন্দুদের প্রতি দরদী যে দল নির্বাচনে দাঁড়াইবে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধভাবে সেই দলটিকে ভোট দেওয়া উচিৎ। তাহা হইলেই হিন্দুরা সম্মান-সম্ভ্রম, দরদ—সবকিছুই পাইবে, নচেৎ নহে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

[illegible]

—আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোধরার রায় : বিচার ও বিশ্লেষণ

নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

কয়েকদিন আগে বিশেষ আদালত গোধ্‌রা-কাণ্ডের ব্যাপারে রায় দেওয়ায় অনেক বিতর্কের অবসান ঘটেছে। ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ নং কামরায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৫৯ জন করসেবকের মৃত্যু হয়। তাতে মারা যান ২০টি শিশু এবং ১৫ জন মহিলাও।

ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় প্রায় সারা গুজরাট জুড়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেছিল এবং সরকারী হিসেবেই তাতে ১২০০ মানুষের প্রাণবলি ঘটেছিল। সেই দাঙ্গার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিষ্ক্রিয়তা-এমনকী, প্রচ্ছন্ন মদতের অভিযোগ তুলেছিলেন দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' নেতারা। তাঁকে তখন বলা হোত 'মৌৎ কা সওদাগর'।

গুজরাট—সরকার কিন্তু তখন গোধরার ব্যাপারে ৬ মার্চ (২০০২) তদন্তের জন্য শাহ্‌-কমিশনকে নিযুক্ত করেছে। কিন্তু উক্ত আবার ক্ষমতায় বসিয়েছেন। কোনও কোনও লেখক-লেখিকা তাতে গুজরাটের ভোটারদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন নির্মমভাবে।

আমরা তখনই লিখেছিলাম যে রিপোর্টটা বিভ্রান্তিমূলক। প্রথমত, কামরার ভেতরে আগুন লাগলে কেউই বেরিয়ে আসতে পারেননি কেন, দরজার পাশের যাত্রীরা তো সেটা করতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, ফরেন্সিক রিপোর্টে কেরোসিন জাতীয় কিছুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, বরং পাওয়া গেছে পেট্রোলের গন্ধ। তৃতীয়ত তার রিপোর্টেও সন্দেহ করা হয়েছিল যে, মনে হচ্ছে দরজা বাইরে থেকেই বন্ধ ছিল।

এর পরে (১৩ অক্টোবর, ২০০৬) হাইকোর্ট ওই কমিশনের রায় অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে, বাতিল হয়েছে রাম্নাজনিত দুর্ঘটনার তত্ত্বটাই। আমাদেরও বারবার মনে হয়েছে, ওটা ছিল একটা নারকীয় ও গভীর চক্রান্ত। যেহেতু এভাবে প্রাণ দিত। এরা কেন পাকিস্তান বা বাংলাদেশে গিয়ে রাজনীতি করে না কে জানে?

অবশ্য কোনও কোনও বড় পত্রিকার স্বল্পবুদ্ধি সম্পাদক এতে খুশী হননি। তাঁদের মতে, চক্রান্তের তত্ত্বটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া তাঁদের আশা— বিশেষ আদালতের রায় উচ্চ আদালতে খারিজ হতেই পারে (তাতে তাঁরা অবশ্যই উদ্বেলিত ও পুলকিত হবেন)। সবচেয়ে বড় কথা— এই রায় সম্বন্ধে সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে তাঁরা আবার গুজরাট-দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদীর দায়ের কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ঘটনাটা গোধরা- ট্রেন-অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপার নিয়ে, তাহলে ধান ভানতে শিবের গাজন কেন?

এঁদের সুবিধে হলো— হাতে কলম আছে আর সঙ্গে পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে, সুতরাং ছাইপাঁশ যা লিখবে, সেটা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পাবেই। মনে

কমিশন কাজ শুরু করার আগে থেকেই বলা শুরু হয়েছিল যে, অগ্নিকাণ্ডটা ঘটেছিল কামরার ভেতর থেকেই—করসেবকরা রান্নাবান্না করছিলেন, সেটা থেকেই অগ্নিকাণ্ডটা ঘটেছে।

তাৎপর্যের ব্যাপার হলো--- প্রগতিশীলতার পরিচয় দিতে গিয়ে তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব রেলের তরফ থেকে আবার ব্যানার্জী তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন একই বিষয়ে তদন্তের জন্য (৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৪)। ২২ মে তারিখে শাহ-কমিশন পুনর্গঠিত হলো, নানাবতী কমিশন সেই কাজ নতুন করে শুরু করেছিল।

এটা লক্ষণীয় যে, আমাদের দেশে প্রায় প্রতিদিন কোনও বিষয় নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়, যদিও তাদের অধিকাংশের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় না বা সুপারিশকে কার্যকর করা হয় না। কিন্তু ব্যানার্জী-কমিশন পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আগেই একটা অন্তর্বর্তী রিপোর্টে দিয়েছিল এবং তাতে ছিল দুর্ঘটনার তত্ত্বটা— অর্থাৎ কামরার ভেতর থেকেই আগুনটা লেগেছিল, এটা কোনও ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তের ব্যাপার নয়।

বলা বাহুল্য, রাজ্যের নির্বাচনের আগে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় সেকুলারবাদীরা আহ্লাদে আটখানা হয়েছিল, লালুবাবুও এর মাধ্যমে নির্বাচনী ফায়দা তোলার আশা করেছিলেন। তবে তাতে কাজ হয়নি, ভোটাররা নরেন্দ্র মোদীকেই করসেবকরা গিয়েছিলেন অযোধ্যার রামমন্দিরের ব্যাপারে, কিছু উগ্রপন্থী মুসলীম চক্র এই বর্বরোচিত কাজটা করেছে। আর তার ফলে যে দাঙ্গাটা হয়েছে, সেটাও মোটেই একতরফা ছিল না— পুলিশের রেকর্ডেই আছে— হতাহত ও ধৃতের সংখ্যা প্রায় সমান। এমনকী 'স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম' (সিট্‌) নরেন্দ্র মোদীকে সম্প্রতি এই ব্যাপারে 'ক্লীনচিট্‌' দিয়েছে।

তবে সম্প্রতি ঘটেছে সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ২০০৯ সালের ১ জুন বিশেষ আদালতে এই মামলার শুনানী শুরু হয়। ইতিপূর্বে অবশ্য নানাবতী কমিশন তাঁর রায় দিয়েছে--- তাতেও ছিল দুর্ঘটনা ঘটানোর তত্ত্ব— অর্থাৎ ২০০৮-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর এই কমিশন জানিয়ে দিয়েছিল যে, বাইরে থেকেই তাণ্ডব লাগিয়ে এতগুলো মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যানার্জী কমিশনের রিপোর্ট শুধু উচ্চ আদালতে নয়--- নানাবতী কমিশনের কাছেও খারিজ হয়ে গেছে সঙ্গত কারণেই।

এবার বিশেষ আদালতে ৯৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট্‌ দেওয়া হয়েছিল— তার মধ্যে ৩১ জনকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটা ট্রেনের কামরা বন্ধ করে ৫৯ জন করসেবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা এবং আরও কিছু নারী ও শিশুকে সেই সঙ্গে হত্যা করাটা কী ধরনের অপরাধ— সেটা মেকি প্রগতিশীলরা বুঝত যদি তাদের কেউ হবে-এরা কত বড় বোদ্ধা।

আগে থেকেই বিশেষ আদালতের রায় উল্টে যাওয়ার আশাটা প্রকাশিত হলো কেন? নানাবতী কমিশন এবং বিশেষ আদালত তো একই ধরনের রায় দিয়েছে। তাদের ওপর ভিত্তি করে সম্পাদকীয় লেখা যেত। ব্যানার্জী কমিশন হঠাৎ বিধানসভার নির্বাচনের আগেই অন্তর্বর্তী রিপোর্ট দিল কেন? কার স্বার্থে? শাহ্‌-কমিশন যখন কাজ শুরুই করেছে, হঠাৎ ছয় মাস পরে একই বিষয় নিয়ে তদন্ত করার জন রেল-মন্ত্রক নতুন একটা কমিশন বসাল কেন? দুটো কমিশনের রায় দুই রকম হয়েছে, তাহলে প্রথমটাকে গুরুত্ব দেওয়া হলো কি কারণে? এবার স্পেশাল আদালতের রায় নানাবতী কমিশনের রায়ের সঙ্গে মিলে গেছে— তবু উচ্চতর আদালতে সেটা খারিজ হতে পারে বলে আত্ম-সান্ত্বনা কেন?

হিন্দু-পদবী হলেও এরা কি মুসলমান?' এরা ধর্মান্তরিত ব্যক্তি? করসেবকদের প্রতি ওই জঘন্য অপরাধের ব্যাপারে ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করতে এত আপত্তি কেন? অগ্নিকাণ্ডে মৃত নারী ও শিশুরা কি বাব্‌রি (সেটা মস্‌জিদই নয়) ভাঙতে গিয়েছিলেন?

আমরা কোনও সম্প্রদায়ের বিদ্বেষী নই— এই দেশ সকলের। সব ধর্মের স্থান আছে এখানে। কিন্তু অপরাধ অপরাধই। সেক্ষেত্রে যারা পক্ষপাতিত্ব করে, তাদের মনুষ্যত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন জাগে।

পোস্টারে ব্যাণ্ডেজ মাথায় (ওপরের) ছবিটি নীরজ কুমারের। গত ৩০ অক্টোবর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাশ্মীরের স্বাধীনতার স্বপক্ষে মাওবাদীদের প্রকাশ্য সংগঠন ইউনাইটেড স্টুডেন্টস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট আয়োজিত 'আজাদী' শীর্ষক আলোচনা-চক্রের বিপক্ষে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা বিক্ষোভ দেখালে হোটেল ম্যানেজমেন্টের ছাত্র ও পরিষদের কলকাতা কর্মসমিতির সদস্য নীরজ মাওবাদীদের হাতে গুরুতরভাবে জখম হন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকেই উৎসারিত সেই আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক পরিষদের কার্যকর্তাটির এই ছবি আচমকাই জায়গা করে নিয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি রাজনৈতিক পোস্টারে। এর তীব্র নিন্দা করে বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সম্পাদিকা পারুল মণ্ডল জানিয়েছেন তাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগে ইতিমধ্যেই এফ আই আর দায়ের করেছেন এবং নির্বাচন কমিশনের কাছেও দারস্থ হয়েছেন।

দেওয়াল লিখন পড়ুন

(১ পাতার পর)

শুধু মমতা ও তাঁর দলের নেতাদের ক্ষমতায় বসাতে নয়, যারা কাজ করবে মানুষের কল্যাণে তাদের জন্যই হবে।

তাই বিমানবাবুরা পরিবর্তনের শ্লোগানকে ষড়যন্ত্র বলে বিদ্রূপ করে ভুল করছেন। গত এক দশক ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদলের চোরাস্রোত পশ্চিমবঙ্গে বয়ে চলেছিল এবার তা 'সুনামি' হয়ে বাম দুর্গে আঘাত হানবে। গত লোকসভার ভোটের ফলাফল অনুসারে রাজ্যের ২৯৪ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাত্র ১০০টি-তে বাম প্রার্থীরা এগিয়ে ছিল। তারপর, পুরসভার নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় সেই ১০০ টি বিধানসভা কেন্দ্রেও বাম সমর্থনে ভাটার টান ধরেছে। এবং সমর্থনে ধস্ নেমেছে ঘুরে দাঁড়ানোর শত সহস্র প্রচারের পরেও। পশ্চিমবাংলার মানুষ আর বামপন্থীদের চাইছে না— এই পরম সত্যটি সিপিএম নেতৃত্ব যত তাড়াতাড়ি বোঝেন ততই রাজ্যবাসীর মঙ্গল। তাঁদের মনে রাখতে হবে 'লাল সন্ত্রাস' ছড়িয়ে রক্তের হোলি খেলে ভোটে জেতার দিন এখন শেষ হয়েছে।

কালমাদি-ই নেই

(১ পাতার পর)

কোথাও কালমাদির নাম নেই। এব্যাপারে গেমস্ কমিটির চীফ্ এক্সিকিউটিভ জার্নেল সিংহ প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, অনেক ব্যক্তি, সংস্থা এই বিশাল কর্মযজ্ঞে যুক্ত ছিলেন। সেজন্য সিদ্ধান্ত গতভাবে ব্যক্তিবিশেষের নাম ও ছবি বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর আরও বক্তব্য— কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা কিভাবে কার্যকরী হলো, কেন নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ হতে পারেনি, খরচ বেড়ে গেল— এসব খুঁটিনাটি ওই লীগ্যাসি রিপোর্টে রয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রমতে, এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ছিল। তাছাড়া, সুরেশ কালমাদি, ললিত ভানোতসহ অন্যান্যদের দুর্নীতি নিয়ে ইতিমধ্যে সি বি আই তদন্ত চলছে। সেটাও একটা কারণ। উপরোক্ত লীগ্যাসি রিপোর্টে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো— গেমস্ আয়োজন সমিতির কিছু কর্মকর্তাদের দ্বারা যে কয়েকটি ব্যবস্থায় দেরী হয়েছে, সময়মতো হয়নি। সেই বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে। কালমাদি নিয়ে কোনও কথাবার্তাই নেই, অথচ প্রধানমন্ত্রী বার বার বলেছেন, দুর্নীতিগ্রস্তদের রেহাই নেই। এই পরস্পর বিরোধিতাই সন্দেহের কারণ।

একটি পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

(১ পাতার পর)

দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৯, ৩০২, ৩০৭, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩২, ৩৯৫, ৩৯৭ এবং ৪৩৬ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া রেলওয়ে আইনের বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ আনা হয়। গোধরায় ঠাণ্ডা মাথায় অযোধ্যা ফেরৎ করসেবকদের ট্রেনের কামরায় জ্বালিয়ে মারার ঘটনায় গুজরাট জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাজ্যব্যাপী হিংসার আগুনে এক হিসেবে ৭৯০ জন মুসলমান ও ২৫৪ জন হিন্দু মারা যায়। একচোখা ভাবে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে একশ্রেণীর 'হলুদ' সংবাদমাধ্যম এবং ছদ্ম সেকুলারপন্থী এবং তথাকথিত মানবাধিকারবাদীরা। অথচ দাঙ্গায় হিন্দুদের মারা যাওয়া, গোধরার গণহত্যা বিষয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। এদেরকে প্রশ্ন— যদি হজ ফেরতদের পুড়িয়ে মারা হোত তাহলে কি হোত?

ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ

(১ পাতার পর)

জন্য বাজপেয়ীর কাছে দাবি জানিয়েছে। ইতিমধ্যে সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাতও আসরে নেমে পড়েছেন। এই দুই দলের নেতানেত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলছে কে কত বেশি মুসলিম দরদী। কারণ মুসলিম ভোটারদের মধ্যে ইমামদের প্রচণ্ড প্রভাব। ইতিমধ্যে তৃণমূল নেতৃবৃন্দ বলছেন ইমামদের ন্যূনতম বেতন হওয়া উচিত ২৫ হাজার টাকা। তাছাড়াও যেসব মোয়াজ্জিনরা শুধু মসজিদে আজান দেন তাদের মাইনে হওয়া উচিত ১৫০০০ টাকা প্রতিমাসে। পশ্চিমবঙ্গে ৩০ হাজার মসজিদ রয়েছে, তাছাড়াও ২৫ হাজার ওয়াকফ্ রয়েছে; সেখানেও সমসংখ্যক মসজিদ রয়েছে। কোনও কোনও মসজিদে একাধিক ইমাম এবং একাধিক মোয়াজ্জিন রয়েছে। অতএব মুসলিম ভোটের কথা চিন্তা করে সরকার এদের বেতন দিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না বলে মনে হয়। এই সাথে বর্তমান পত্রিকার ২০০৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর একটা সংবাদ উল্লেখ করছি, ''পুরোহিত মানিক গাঙ্গুলির তিন কন্যা একসাথে বিষ খেল, কারণ দরিদ্র পুরোহিত মেয়েদের বিবাহের পণের টাকা জোগাড় করতে পারেনি। পুরোহিতের বাড়ী বাঁকুড়ার কোতলপুরে, তার মধ্যে ময়না (২০) মৃত। দুইজন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে।''

এখানে একটা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক— মুসলমান ইমামরা যদি সরকারি তহবিল থেকে মাইনে পেতে পারে তবে হিন্দু পুরোহিত, শিখ গ্রন্থী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, খৃস্টান ফাদার এবং জৈন মুনিরাই বা কেন সরকারের থেকে মাইনে পাবেন না?

এই সময়

ডিভোর্স যারে কয়

উফ্! এটা কিন্তু সত্যিই বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! কংগ্রেস কি না আজ দুর্নীতি, কাল ডি এম কে, পরশু মমতা নিয়ে বেশ বিপাকে, এই অবস্থায় কেউ কখনও ডিভোর্সের মতো পেটি কেসে কারুর পেছনে লাগে? এ ডিভোর্স যদিও পারিবারিক ডিভোর্স নয়, তবে বিবাহ আইন (সংশোধনী) বিল, ২০১০-এর অন্তর্গত 'পুনরুত্থানের অসাধ্য (ইররিট্রিভিবেবল) বিবাহ-বিচ্ছেদ' সংক্রান্ত একটি ধারা। যে ধারাই প্রস্তুত করে ডিভোর্সের ক্ষেত্র। আর এই ডিভোর্সের মামলার প্রেক্ষিতেই সংসদে পুনরায় ডিভোর্স হচ্ছে কংগ্রেস এবং বাম-বিজেপি-র। বিজেপি-র বক্তব্য— সম্পত্তি এবং সন্তানদের থেকে মহিলাদের বঞ্চিত করতে এই আইনের অপব্যবহার হতে বাধ্য।

শতবর্ষের আঙিনায়

গত ৮ মার্চ শতবর্ষে পদার্পণ করল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সেই উপলক্ষে ভারতীয় উড়ান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে তিনটি বিশেষ 'অল উওম্যান' ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ওইদিন। সেদিন শুধুমাত্র পাইলট কিংবা কেবিন ক্রু-রাই নন, চেক-ইন এবং গ্রাউন্ড স্টাফরাও ছিলেন মহিলা। তিনটি ফ্লাইটের মধ্যে একটি ছিল আন্তর্জাতিক, দিল্লী থেকে টরেন্টো পর্যন্ত; বাকি দুটি গৃহ-উড়ান। তবে শুধু নারী দিবস উপলক্ষেই নয়, ভারতে নাগরিক উড়ানের শতবর্ষ পূর্তিও ছিল এর অন্যতম কারণ।

ডাক্তারীর ভার লাঘব

ভবিষ্যতের ডাক্তারদের পরীক্ষার ভার লাঘব করতে উদ্যোগী হলো দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। গত ৭ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট মেডিক্যাল কাউন্সিল অব্ ইন্ডিয়া (এম সি আই)-কে অনুমতি দিয়ে বলেছে, দেশের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলির এম বি বি এস ও স্নাতকোত্তর আসনগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে একটি মাত্র সার্বিক পরীক্ষার (কমন এন্ট্রান্স টেস্ট) আয়োজন করতে হবে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের হয়রানি ও ঝক্কি কমবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। যদিও মাদ্রাজ হাইকোর্টের এম সি আইয়ের এই আবেদনের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সুফল আপাতত অধরাই থাকছে তামিলনাড়ুর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে।

বিলম্বিত বোধদয়

সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনার পি জে থমাস-কে বাঁচানো একপ্রকার দুঃসাধ্য বুঝেই পিছু হটছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। গত ৭ মার্চতিনি সিভিসি পদে পি জে থমাসের নিয়োগকে বিচারের ভ্রান্তি (এরর অব্ জাজমেন্ট) বলেও আখ্যায়িত করেছেন। লোকসভাতে তিনি এও বলেছেন, যে এর 'সম্পূর্ণ দায়িত্ব' নিতেও তিনি প্রস্তুত। সরকার যে সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে যথেষ্ট মান্য করছে (নাকি করতে বাধ্য হচ্ছে?) তা বোঝাতে চেষ্টার কসুর করছেন না প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে, আগাগোড়া সব জেনেশুনেও কেন এতদিন নিশ্চুপ ছিলেন তিনি? সুপ্রিম কোর্টের হুড়কো-ই কি তাঁর বিলম্বিত বোধোদয়ের কারণ?

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. প্রকাশনের স্থান ঃ ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬।২. প্রকাশনের সময় ঃ সাপ্তাহিক। ৩. মুদ্রকের নাম ঃ শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়। ঠিকানা ঃ ৫/৬, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী,
কলকাতা -৪১। ৪. প্রকাশকের নাম ঃ শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়। ঠিকানা ঃ ৫/৬, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী, কলকাতা -৪১।
৫. সম্পাদকের নাম ঃ শ্রী বিজয় আঢ্য। নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়।
ঠিকানা ঃ ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা -৬। মালিকানা ঃ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট।
ঠিকানা ঃ ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা -৬।
ট্রাস্টীর সদস্যবৃন্দ ঃ অধ্যাপক অমল কুমার বসু, ২৬, বিধান সরণি,
কলকাতা -৬। শ্রী যুগলকিশোর জৈথলিয়া, ১৬১/১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা -৭। শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত, ৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা -৬।
শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, ৬৪, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা -৬৭।
শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫/৬, ওয়েস্ট পুটিয়ারি কলোনী,
কলকাতা -৪১। শ্রী সত্যনারায়ণ মজুমদার, পুড়াটুলী, মালদা। শ্রী অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, ৯৫বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭৩। শ্রী দেবাশিস লাহিড়ী,
২/৫, সর্ট রোড, দুর্গাপুর - ৪। শ্রী প্রদীপ কুমার দে, ১০/৩৮, বিজয়গড়,
পোঃ যাদবপুর, কলকাতা - ৩২।
আমি শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

তারিখ - ০৯.০৩.২০১১

প্রকাশকের স্বাক্ষর
Ranendra Lal Bandyopadhyay
রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আতিথি কলম

শহরে মাওবাদীদের স্বরূপ ও সমর্থন

বিশ্বরঞ্জন

শহর ও শহরতলীতে আপনি এমন সব মাওবাদীদের দেখতে পাবেন যাদেরকে আপাতদৃষ্টিতে সুকুমার ও কোমলমতি বলে মনে হতেই পারে। তাদের চেহারা হাব-ভাব, চালচলন দেখলে বুঝতেই পারবেন না যে, এই আপাত নিরীহ সরলমতি লোকেরা এমন একটি সংগঠনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত যারা হিংসাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে মাওবাদী একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে সদা সক্রিয়। সাধারণত, দেখতে নিরীহ এইসব ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা বুদ্ধি জীবী এবং বিচারপতিদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং ভ্রান্তির অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছেন বা যান। যেহেতু ওদের উপর উপর ভালো লোক, কোমল, সুকুমার ও সরলমতি বলেই মনে হয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় এরা কীভাবে মাওবাদী হতে পারেন? কিন্তু যদি মাওবাদীদের গোপন দলিল-দস্তাবেজ (বাজেয়াপ্ত) একটু তলিয়ে দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে— শহরাঞ্চলে মাওবাদীদের কাজকর্ম চালু রাখতেই এদের ওরকম দেখায় বা দেখানো হয় যা দলীয় কূটনীতিরই অঙ্গ। দলের প্রয়োজনে কৌশলগত কারণেই এদের ওই ছদ্মবেশ প্রয়োজন। এটা অবশ্যই ঠিক কথা যে, ওই সকল শহুরে ভদ্রলোকেরা পাহাড়-জঙ্গলে বন্দুক হাতে ঘোরাফেরা করেন না বা করতে পারবেন না। তবে ওরা যে কাজটা নিষ্ঠাসহকারে করে থাকেন তার ফলে, জঙ্গলে গোপনে সক্রিয় মাওবাদী গোষ্ঠীরা ধীরে ধীরে জঙ্গল এলাকায় এবং শহরেও নিজেদের সংগঠনের ভিত মজবুত করতে পারে।

এজন্য ওরা ছোট ছোট 'কারণ' বা উপলক্ষ্য তৈরি করে নেন। এবং মাওবাদীদের হিংসাত্মক কাজকর্ম নিয়ে মুখে 'রা' কাড়েন না। যদি হিংসা চরমে পৌঁছায়, নিন্দা না করে যখন উপায় থাকে না, তখন তাঁরা এক লাইনেই বিরোধিতার কাজটা সেরে ফেলেন। তারপর মাওবাদীরা কেন এই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাল তার ব্যাখ্যায় মহাভারত গড়ে তোলেন। ঘটনা হলো, যারা মাওবাদীদের এই নিষ্ঠুর হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে সংকল্পবদ্ধ, তাদেরকে বার বার আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজটা আর কতদিন ওইসব সরল-কোমল মাওবাদীরা করতে থাকবেন?

যতদিন পর্যন্ত না পুলিশ অফিসাররা মাওবাদীদেরকে মোকাবিলা বন্ধ করে দেন, আর মাওবাদীরা ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করে শাসন ক্ষমতা দখল করে। দূর থেকে দৃশ্যমান সহজ সরল কোমলমতি মাওবাদীরা সাধারণ মানুষকে সামনা-সামনি বিভ্রান্ত করে দেন। সাধারণ মানুষ ভাবে ওরা তো ঠিক কথাই বলছেন। যাদের দেখতে এতো সুকুমার, কোমল, সরল তাদের কথা কি ভুল হতে পারে?

যদি ভুলক্রমে আপনি একবার ওদের দিকে আঙুল তুলে ফেলেন, তাহলেই গেছেন! তখন কিন্তু ওঁরা আর সরল, কোমল, নরম, সুকুমার আদৌ থাকবেন না। ওঁরা অসভ্যতার সীমা পার করে আপনাকে গালাগালি দেবেন, মিথ্যা প্রচারে নেমে পড়বেন,— প্রয়োজনে সাইবার স্পেস প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন, ধর্না-দেবেন, বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন।

আরও এক সমস্যা রয়েছে। যদি ভুলক্রমে আপনি একবার ওদের দিকে আঙুল তুলে ফেলেন, তাহলেই গেছেন! তখন কিন্তু ওঁরা আর সরল, কোমল, নরম, সুকুমার আদৌ থাকবেন না। ওঁরা অসভ্যতার সীমা পার করে আপনাকে গালাগালি দেবেন, মিথ্যা প্রচারে নেমে পড়বেন,— প্রয়োজনে সাইবার স্পেস প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন, ধর্না দেবেন, বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন।

যদি আপনারা আমার নাম দিয়ে (বিশ্বরঞ্জন, ডি জি পি-ছত্তিশগড়) ইন্টারনেটে সার্চ করেন তাহলে দেখবেন আমার ছবিকে বিকৃত (ফটোগ্রাফ) করে কেমন সব গালি-গালাজ করা হয়েছে। আমার অবশ্য এতে কোনও কিছু ফারাক মনে হয় না, তবে অন্যদের হতে পারে। যদি সাইবার স্পেসের সাহায্যে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে চুপচাপ থাকাই ভালো। ওই কোমল, পেলব, সুকোমলমতি মাওবাদীদের হাতে হাত মিলিয়ে নেওয়াই ভালো। ব্যাস্, মাওবাদীদের আর কি চাই?

ভুল গলতী বৈঠী হ্যায় জিরহ
বখ্‌তর পহনকর তখত্ পর দিল কে
চমকতে হ্যায় খড়ে হথিয়ার উসকে
আঁখে চিলকতী হ্যায় সুনহরী তেজ
পথরসী...

সবার মুখে রা নেই।— ইবনে সিন্না, আল বিরুণী, এমনকী দাড়িওয়ালা সিপাহসালার (সেনাপতি), বুদ্ধি জীবী, ব্যবহারজীবী, ইংরেজী সংবাদমাধ্যম— সবাই নিশ্চুপ।

আমার নামে লেখা হয়েছে আমি নাকি নিজেই মাওবাদীদের সঙ্গে আপস করে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়েছি। মাওবাদীদের সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়েছি।

মাওবাদীদের শহর এলাকার সংগঠনের আরও এক সমস্যা আছে। এরা নভোমণ্ডলের কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল-এর মতো। ভূগোল-শাস্ত্র অনুসারে কেউ কখনও ব্ল্যাক হোল-কে দেখতে পাননি। তা থেকে কোনও আলো কখনও বেরই হয় না, কেবলমাত্র ব্ল্যাক হোল-এর আশপাশের ঘটনাবলী থেকে আমরা শুধু অনুমান করতে পারি যে, ওই স্থানে 'ব্ল্যাক হোল' আছে। অর্থাৎ 'প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান' নয়, পরোক্ষ বা সারকামস্ট্যানসিয়াল সাক্ষ্যপ্রমাণের সাহায্য নিতে হয়। এমনিতে মাওবাদীদের গোপন কাগজপত্রে এদের বিষয়ে বলা হয়েছে— এই ধরনের লোকেরা কখনও শত্রুর (রাজ্য কর্তৃপক্ষ) সামনে প্রকাশ্যে আসে না। ওঁরা নিজেদেরকে কখনও বলবেন না যে, ওঁরা মাওবাদী। একবার কল্পনা করুন, যদি দেশে মাওবাদী একনায়কতন্ত্র কায়েম হয় তাহলে কি হবে? হতে পারে আপনাদের ছেলেমেয়েরা সারাজীবন জেলেই পচে চলেছে— কোথাও কোনও শুনানি পর্যন্ত হলো না।

চীনের রাষ্ট্রপতি লিও শাও চি যখন মাও (মাও জে দং)-এর বিরোধিতা করতে শুরু করেন তাঁকে তখন তার চুল ছিঁড়ে তুলে নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ইয়াং-কে মারধোর করে প্রচণ্ড কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। এদেশে মাওবাদীদের ব্যবহার আপনাদের সঙ্গেও ওরকম হতে পারে। জুঙ্ চেঙ্-এর বাবা, মাও জে দং-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরে মতভেদ হয়। তখন তাকে শুধু নয়, তার পরিবারের সবাইকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়। একজন চীনা লেখিকার সঙ্গে মতভেদের কারণে তাঁর মাকেও কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা হয়। তাঁর মাথার চুল ছিঁড়ে উপড়ে ফেলা হয়েছিল। শহরে যেসব কেতাদুরস্ত সরল কোমল (বাইরে উপর উপর তাই দেখায়) ব্যক্তি, বুদ্ধি জীবী, ব্যবহারজীবীরা মাওবাদীদের সমর্থন দিয়ে চলেছেন, তাদের কপালেও ওরকম যাতনা, পীড়া দেওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। যেমনটা চীনারা মাও-এর জমানায় হাতে হাতে পেয়েছেন।

অসুবিধা হলো, ওইসব সরল, কোমল, সুকুমার ও নির্দোষ চোখমুখ হাব-ভাবের মাওবাদীরা 'ভোলা-ভালা' সেজে থাকবেন। আর বলবেন, 'আমরা মাওবাদী নই'। অন্যদিকে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে নির্দোষ দেখার চশমা চোখে দিয়ে কিছুই করব না। উল্টে যারা জীবন দিয়ে জীবন বাজি রেখে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল রাখতে লড়াই করছেন তাদেরকেও নিন্দামন্দ করব। —সন্মার্গ-এর সৌজন্যে।

লেখক ছত্তিশগড় রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশক

অন্য রকম

প্রজাপতি এক ঝাঁক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এই ভরা বসন্তে দিগ্বিদিকে এখন প্রজাপতয়ে নমঃ-র জয়জয়কার। বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত পরিবেশ-দূষণের ঠেলায় প্রজাপতি-র সংখ্যা শহরে তো আগেই কমে গিয়েছিল, এখন গ্রামীণ এলাকাতেও তা ক্রমহ্রাসমান। কিন্তু বিয়ের বাজারে প্রজাপতির কদর নেই— এমন কোনও অপবাদ নিন্দুকেরাও দিতে পারবেন না। নিন্দুকদের কথা বরং থাক, এমন একটি প্রজাপতয়ে নমঃ-র গল্প (যা গল্প হলেও সত্যি) বলা যাক, যেখানে পরিবেশ, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, উপাসনা-পদ্ধতি, জাত-বর্ণ সবমিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সৌজন্যে— একটি গণবিবাহ।

শেহনাজ শেখ, রহিমা কাদিয়া কিংবা শেহবাণী শেখ—এরকম অন্তত জনা-পঁচিশেক মুসলিম রমণীর সঙ্গে চৌদ্দকুলে সম্পর্ক নেই জয়েশ দালওয়াদি-র। সম্পর্ক নেই বলাতে একটু গ্র্যামাটিক্যাল মিসটেক হয়ে গেল। বলা উচিৎ যে, সম্পর্ক ছিল না। কারণ বর্তমানে ওই তিন মুসলিম রমণীর সঙ্গে তাঁর দিব্যি একটা সম্পর্ক হয়েছে। যে সে সম্পর্ক আবার নয়, কারণ ওই তিন মহিলার বিবাহে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি 'কন্যা-সম্প্রদান' করার প্রাথমিক কাজটা সারতে হয়েছে তাঁকেই। অনুষ্ঠানটি ছিল গণ-নিকাহের (নিকাহ্ মানে বিবাহ)। উদ্যোক্তা— গোধরা সমগ্র মুসলিম সমাজ। সবরমতী এক্সপ্রেসের দগদগে ঘা না শুকোতেই আদালত প্রধান অভিযুক্ত সমেত অন্তত ৬৩ জনকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন গোধরা-কাণ্ডে। শাস্তিপ্রাপ্তের সংখ্যাটা এর অর্ধেক (৩১)। সেখানকার মানুষ শুধু সান্ত্বনা পাচ্ছেন যে গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে করসেবকদের ওপর হামলাকে পরিকল্পিত চক্রান্ত বলে আমেদাবাদ হাইকোর্ট স্বীকার করে নেওয়ায়। সেই হামলার পর এক দশক অতিক্রান্ত।

সময়ের ভার গুজরাতবাসীকে কতটা জর্জরিত করেছে, লাগাতার অপবাদ কতটা মর্মাহত করেছে, অন্যায় অবজ্ঞা তাদের কতটা আশাহত করেছে, কেন্দ্রের বঞ্চনা কতটা রিক্ত করেছে— এই প্রশ্নগুলিকে অবান্তর বলে মনে হচ্ছিল গত ২৭ তারিখে। বিবাহ না হওয়া জনা পঁচিশেক মুসলমান রমণীকে সমাজের অক্টোপাশ থেকে মুক্ত করতে উপাসনা-পদ্ধতির গণ্ডীটুকু বিসর্জন দিয়ে কারা এগিয়ে এসেছেন তার বিবরণ শুনুন গোধরা মুসলিম সমাজের কমিটি-সদস্য রফিক তিজোরিওয়ালা-র মুখেই— ''হিন্দুদের সঙ্গে এক জৈন ব্যবসায়ী, এক দলিত সরকারী কেরানী, সোনী সমাজের এক স্বর্ণবিক্রেতা এবং প্যাটেল পদবীধারী এক ব্যবসায়ী সবাই মিলে মুক্ত হস্তে এই মুসলিম মেয়েদের জন্য দান করেছেন। যেমন--- তিনটে মেয়ের বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের জন্য দালওয়াদি ৩,০০০ টাকা দিয়েছেন।''

প্রজাপতয়ে নমঃ— গোধরায় গণবিবাহের দিনে।

গোধরা মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন সভাপতি মহম্মদ হুসেন কালোটা-র (গোধরা মামলায় খালাস হওয়াদের একজন) চোখে-মুখেও কৃতজ্ঞতার ছাপ। শুধু আর্থিক সাহায্যই নয় যেভাবে হিন্দুরা এগিয়ে এসে 'কন্যা সম্প্রদান'-এর গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন তাতে ছুঁৎমার্গ কিংবা মানসিক দূরত্ব— দু'টোই ঘুচে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

গোধরার সামাজিক পটভূমিতে এই বিবাহ তাই অপরাধের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার স্বীকৃতি— একথা বললে কি আজ খুব অত্যুক্তি হবে?

পুনশ্চঃ গুজরাটের পাঁচমহল জেলার চাঁদনী-চকের নিকটবর্তী মসজিদ-ই কুবায় আয়োজিত এই নিকাহে এসেছিলেন প্রায় ৮০০০ নিমন্ত্রিত অতিথি। অ-মুসলিমদের ধর্মীয় মর্যাদা-কে গুরুত্ব দিয়ে মেনুতে কেবল নিরামিষ খাদ্যেরই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সমস্যাই রাজনীতিকদের মূলধন যা কেউ হাতছাড়া করতে চান না

সাধন কুমার পাল

না, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড নয়, উত্তরবঙ্গে সিপিএম-এর ভোট প্রচার শুরু হয়েছে ৮ ফেব্রুয়ারী ডুয়ার্সের নাগরাকাটা থানার শিবচুতে পুলিশের গুলির আওয়াজ দিয়ে। সেদিন কোন পরিস্থিতিতে গুলি চালানো হয়েছে, গুলি চালানো সত্যিই প্রয়োজন ছিল কিনা, রাবার বুলেট চালিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা যেতো কিনা, গুলি চালালেও সেই গুলি কেন বিক্ষোভকারীদের শরীরের নিম্নাংশে না লেগে সরাসরি মাথায় গিয়ে লাগলো, একমাত্র নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই এই সমস্ত প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর পাওয়া যাবে। তবে এক সময় গোর্খাল্যাণ্ডের দাবি তুলে পাহাড়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম করা সিপিএম যে এখন রাজ্যভাগের কতটা বিরোধী, পৃথক রাজ্যের দাবীদারদের যে কঠোর হাতে মোকাবিলা করতে চায়— ভোটের আগে এমন একটি বার্তা রাজ্যভাগের ঘোর বিরোধী সমতলবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এরকম একটি ঘটনা এই দলটির কাছে প্রয়োজন ছিল।

ঠাণ্ডা মাথায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শুধুমাত্র সমতলে সিপিএম নয়, পাহাড়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও এরকম একটি অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক লাভের অঙ্ক কষতে গেলে দেখা যাবে শিবচুতে পুলিশের গুলিতে তিনজন মোর্চা সমর্থকের মৃত্যুর ঘটনায় সিপিএম যতটা লাভবান ঠিক ততটাই লাভবান বিমল গুরুং, রোশন গিরিরা। কারণ, লাগাতর বন্‌ধ, মোর্চা নেতাদের চালু করা সমান্তরাল প্রশাসনের লোকেদের চোখ রাঙানি ও সময়ে অসময়ে জারি করা ফতোয়ার জেরে এদের জনপ্রিয়তা তলানিতে ঠেকে ছিল। মদন তামাং হত্যার পর তো এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে রীতিমতো পুলিশ পাহারায় মোর্চা নেতাদের পাহাড়ে ফিরতে হয়েছে। এরকম একটি অবস্থায় মোর্চার অন্দরমহলে আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছিল যে ষষ্ঠ তপশীল আদায় করে ঘিসিং যেমন পাহাড়ে ফিরতে পারেননি, গোর্খাল্যাণ্ডের বদলে অন্তর্বর্তী স্বশাসন গঠিত হলে তাদের পরিণতিও ঘিসিং-এর মতো হতে পারে। ফলে মোর্চাই পাহাড়ে শেষ কথা এটা প্রমাণ করে ঝুঁকি মুক্ত হয়ে ক্ষমতা ভোগ করা— এমন একটি নিরাপদ ভাবনার দিকে মোর্চা নেতৃত্ব ক্রমশই সহমত হচ্ছিল। ফলে অন্তর্বর্তী স্বশাসন নিয়ে বৈঠক করে নতুন দিল্লি থেকে ফিরে সন্তোষ প্রকাশ করেও, ভোল পাল্টে মোর্চা নেতৃত্বকে নতুন করে আগুন ছড়ানোর ছক কষতে হয়। যার অঙ্গ হিসেবে মোর্চার পদযাত্রা আটকে দেওয়ার পর পুলিশের উপর ঢিল ছোঁড়া, কুকরি দিয়ে একজন মহিলা কনস্টেবলকে কোপানো, শোনা যায় মানুষের ভিড়ের পেছন থেকে গুলি ছুঁড়ে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করা হয় যে লাঠি চার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে অবস্থা আয়ত্তে আনতে না পেরে পুলিশ নাকি সরাসরি গুলি চালিয়ে দেয়। এই সমস্ত ঘটনাবলীকে এজন্যই মৃত্যুর ঘণ্টা বলা হচ্ছে যে, পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলে পুলিশের গুলিতে দুজন মোর্চা সমর্থকের মৃত্যুর ঘণ্টা খানেক সময়ের মধ্যে কোনওভাবেই সরকারি গাড়ী, বাড়ি ও বন-বাংলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব হোত না।

পাহাড়ের পরিস্থিতি এখন ভয়ঙ্কর। দিনের পর দিন বনধ্‌ অবরোধের ফলে মানুষের হাতে কাজ নেই, পর্যটন ব্যবসার সাথে যুক্ত হাজার হাজার মানুষ বেকার, স্কুল কলেজের পড়াশুনা শিকেয় উঠেছে, আসন্ন পরীক্ষার মরশুমে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক অভিভাবিকারা উদ্‌বিগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছেন, রুটিন মাফিক উন্নয়নের কাজ বন্ধ, টানা বনধ্‌ চলার সময় মানুষের ঘরে খাবার থাকে না, রান্নার গ্যাস থাকে না। ঘরে ঘরে চাপা উত্তেজনা, কেউ বা নীরবে কাঁদছেন, কেউ বা বুক চাপড়াচ্ছেন। কিন্তু মোর্চার রক্ত চক্ষুর ভয়ে এই সমস্ত ক্ষোভ প্রকাশ্যে আনার উপায় নেই। কারণ মোর্চা নেতাদের বেঁধে দেওয়া নিয়মের বাইরে প্রতিক্রিয়া জানালে ভিটে ছাড়া হতে হবে।

আসলে এই পোড়া দেশে এমনই এক রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে এখানে বিভিন্ন সমস্যাগুলোই হচ্ছে রাজনীতিকদের একমাত্র মূলধন। ব্যবসায়ীদের মতো এরা কোনও পরিস্থিতিতেই মূলধন হাতছাড়া করতে চায় না। ফলে রাম জন্মভূমি থেকে শুরু করে দার্জিলিং সমস্যা বা তেলেঙ্গানার মতো জিয়ানো সমস্যাগুলো জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মতো মাঝে মধ্যেই লাভা উদ্‌গীরণ করতে থাকে। এরই তাপে জ্বলতে থাকে সাধারণ মানুষ, আর রাজনীতির ব্যাপারীরা নিরাপদ দূরত্বে থেকে এর মিঠে উষ্ণতা অনুভব করে তরতাজা হয়ে উঠতে থাকে। এ জিনিস বন্ধ হওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে 'গোর্খা' আত্মপরিচয়ের জন্য 'গোর্খাল্যাণ্ড' এদেশের নেপালী-ভাষী জনগণের একমাত্র রক্ষা কবচ হতে পারে না। এর বড় প্রমাণ নাগাল্যাণ্ড। যেখানে বিদেশী শক্তির অঙ্গুলি লেহনে পরিচালিত নাগা উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর বেঁধে দেওয়া ছকের বাইরে গেলে নাগা জনগণের ধন-মান-প্রাণ সম্পত্তির কোনও নিরাপত্তা নেই।

পুলিশের গুলিতে নিহত বিমলা রাই।

এছাড়া মনে রাখতে হবে নেপালী ভাষীদের সিংহভাগ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের অংশ। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বসবাসকারী নেপালীভাষীরা এলাকা ভিত্তিক ভাষাগত সংখ্যালঘু হলেও এরা এদেশের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্নতা বোধ করে এমনটা দেখা যায় না। এই বাংলার কোনও জায়গায় বসবাসরত নেপালীদের বাঙালিরা নেপালের নেপালী বলে সন্দেহ করে কাউকে হেনস্থা করেছে এমন একটি নজিরও আজ পর্যন্ত কেউ তুলে ধরতে পারেনি। উল্টে বিমল গুরুং বা সুভাষ ঘিসিং-এর মতো রাজনীতিকরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে পাহাড়ে এমন পরিবেশ তৈরি করেছেন যে বাঙালিরা ওখানে স্বাভাবিক ভাবে বসবাস করার কথা ভাবতে পারে না। তবুও পাহাড়ের সমস্যার ক্ষেত্রে নেপালের নেপালীদের থেকে ভারতীয় নেপালীদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য 'গোর্খা' শব্দটিকে আঁকড়ে ধরে আত্মপরিচয়ের যে সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তোলা হয়েছে, গুরুত্ব সহকারে সেটিকেও বিচার করতে হবে। এটা এজন্যই করতে হবে যে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে এদেশের নেপালীদের মনে এই ভাবনা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বাঙালিদের জন্য বাংলা আছে, বিহারীদের জন্য বিহার আছে,এজন্য গোর্খাদের জন্য পৃথক গোর্খাল্যাণ্ড না থাকলে ভবিষ্যতে এদের নেপালের নেপালী বলে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে।

এরজন্য ১৯৫০ সালে ভারত সরকার ও নেপাল সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি বাতিল করে নেপালের নেপালীদের ভারতের মাটিতে অবাধ প্রবেশ বন্ধ করে এদেশে বসবাসকারী নেপালের নাগরিকদের চিহ্নিত করে ভারতীয় নেপালীদের মনে আত্মপরিচয় সংক্রান্ত যে ভয় জেগেছে সেটিকে দূর করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এতে ভারতীয় নেপালীদের মনে স্বাভাবিক নিয়মেই নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি হয়ে গোর্খাল্যাণ্ড দাবীর প্রাসঙ্গিকতা কমবে। পাশাপাশি দেশভাগের

(এরপর ১৩ পাতায়)

ক্যাগ রিপোর্টে বেকায়দায় তরুণ গগৈ

সংবাদদাতা।। নির্বাচনের মুখে ক্যাগ-এর (CAG) রিপোর্টে এবার আর একবার বেকায়দায় পড়লেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী তরুণ গগৈ। অর্থমন্ত্রী

হিমন্ত বিশ্বশর্মা

তরুণ গগৈ

তরুণ গগৈ এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিফলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কম্পট্রলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট।

২০০৮-০৯-এর বাজেট বক্তৃতায় বিধানসভায় কৃষি এবং কৃষি---সংশ্লিষ্ট বিভাগে ব্যাপক উন্নয়নের ফিরিস্তি দিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী তরুণ গগৈ। প্রসঙ্গত, অর্থদপ্তর বরাবর তরুণবাবুর হাতেই রয়েছে। বাজেটে রাজ্যের কৃষি বিকাশ যোজনা খাতে ১০২.৮৯ এবং আরও অতিরিক্ত ৩৯.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু ক্যাগ জানিয়েছেন যে, অসমে ২০০৯-এর মার্চ পর্যন্ত মার্চ ৫০ শতাংশ অর্থই রাজ্য সরকার খরচ করতে পেরেছে। তাহলে বিকাশের (উন্নয়ন) অবস্থাটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তা সহজেই অনুমেয়। একই সঙ্গে সরকারের কর্মদক্ষতার কথাটাও ভাবতে হবে! একই খাতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১০২.৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এবারেও ৭৯.৮৬ কোটি খরচ হয়েছে। অর্থাৎ অব্যবহৃত রয়ে গেছে বরাদ্দের বাইশ শতাংশ অর্থ। এটাও ৩১ মার্চ ২০১০ পর্যন্ত হিসাব।

অসম সরকারের এসময়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার ক্ষেত্রেও একই অবস্থার কথা বলেছেন ক্যাগ। হিমন্তবাবু রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী। এই দপ্তরের অধীনে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে রাজ্যের তিনটি মেডিক্যাল কলেজ-এর উন্নয়নে এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর জন্য ২৮৭.৫৩ কোটি টাকা অর্থবরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু ২০০৯-এর মার্চ পর্যন্ত ৬৮.১২ কোটি টাকা অব্যবহৃত থেকে গেছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ৩৬৫.৮৮ কোটি টাকা। খরচ হয়েছে ১৮৭.৩৭ কোটি টাকা, এটাও মার্চ ২০১০-এর হিসাব। অর্থাৎ খরচের পরিমাণ মাত্র ৫১ শতাংশের মতো।

ক্যাগ আরও জানিয়েছেন— ২০০৮-০৯-এ প্যারা-মেডিকেল খাতে অতিরিক্ত ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করার কথা থাকলেও তা আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি। সব মিলিয়ে ক্যাগ তাঁর রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাজ্য সরকার ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ বাস্তবায়িত করতে পারেনি। এরপরও কেউ যদি বলেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা বা অবহেলার কথা তাহলে সেটা বেসুরো শোনায়। সাধারণ অসমীয়ারাই বলেন— রাজ্যের সংস্কৃতিই হলো 'লাহে লাহে' (ধীরে ধীরে) সংস্কৃতি।

জলপাইগুড়িতে ধর্মান্তরকরণের চক্রান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা।। জলপাইগুড়ি রাণীনগরের খৃস্টান মিশনারী থমাস ফাদার নামে পরিচিত। রাণীনগরে নতুন বস্তিতে স্থানীয় মানুষের বাড়ির বিভিন্ন দেবতার মন্দির এবং তুলসী বেদীর সম্বন্ধে তিনি নানারকম কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা গ্রামের সাধারণ মানুষ। সেখানে লেখাপড়ার চল নেই। এরই সুযোগ নিয়ে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় কিশোর যুবকদের নানা প্রলোভন দেখানো হচ্ছে।

ইতিপূর্বে ওই গ্রামের কৈলাস মহান্তর পরিবারকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে। আরও অন্যান্য পরিবারগুলিকেও ধর্মান্তরকরণ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রতিনিয়তই এইসব পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাদ লেগেই আছে। প্রশ্ন হলো, কেন এই বিবাদ? কে বা কারা এর ইন্ধন যোগাচ্ছে? সম্প্রতি একটি ঘটনার এর সূত্র পাওয়া গেছে। শ্রীমতী মঞ্জু ঠাকুরের স্বামী ধনেশঠাকুরের রাণীনগর স্টেশন বাজারে সেলুনের দোকান আছে। কয়েকদিন আগে শ্রীমতী ঠাকুর তার প্রতিবেশী কৈলাস মহান্তকে বলেন,— কেন তোমাদের মধ্যে রোজ রোজ অশান্তি হয়? সেইসময় হঠাৎ কৈলাস মহান্তর পুত্র মাণিক মহান্ত লাঠির আঘাতে শ্রীমতী মঞ্জুর মাথা ফাটিয়ে দেয় এবং দুটি হাতও ভেঙ্গে দেয়। শ্রীমতী মঞ্জুকে রক্ষা করতে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে আসে। তারাও আহত হয়। বর্তমানে শ্রীমতী মঞ্জু ঠাকুর হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। শ্রীধনেশ ঠাকুর থানাতে ডায়েরী করতে গেলে পুলিশ প্রথমে ডায়েরী নিতে অস্বীকার করে। কেননা ইতিমধ্যেই থানায় শ্রীমতী মঞ্জু এবং ধনেশ ঠাকুরের নামে ডায়েরী করা হয়ে ছে। এই চক্রান্তের পেছনে কে বা কারা আছে, তার খোঁজ করতে গিয়ে ওই থমাস ফাদারের নাম উঠে আসে। তারই প্ররোচনায় নতুন বস্তিতে অশান্তি লেগেই আছে। ফাদার থমাস থানাকে জানিয়েছেন ধনেশ ঠাকুর নাকি খৃস্টানদের নামে কটুক্তি করছে। যাই হোক, স্থানীয় বাসিন্দাদের চাপে পুলিশ ডায়েরী গ্রহণ করে। অভিযোগ, থমাস সাহেব নিজেদের আড়াল করতে শ্রীমতী মঞ্জুকে হাসপাতালে দেখতে আসে। ডায়েরী তুলে নেওয়ার জন্য টাকার প্রলোভন দেখানো হয়। স্থানীয় মানুষ ফাদার থমাসের কাজকর্ম নিয়ে তদন্তের দাবী জানিয়েছে।

পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে

উন্নয়ন চাইছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি

সাধনানন্দ মিশ্র॥ সুদূর গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিবারণের জন্য তাদের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব কীভাবে সাহায্য পৌঁছে দিয়ে শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়, কীভাবে ছাত্রদের ভবিষ্যতের জন্য কাউন্সেলিং-এর সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায়, কীভাবে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনাকে তড়িঘড়ি রূপায়িত করা যায়, কীভাবে শাসনপদ্ধতির দোষত্রুটি বিচার করে তাকে আরও দক্ষ ও জনমুখী করে আরও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করা যায়,— তা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আন্তঃরাজ্য সুসম্পর্ক গড়ে উঠছে। প্রত্যেক রাজ্য সরকার তার সরকারকে কীভাবে জনমুখী করতে পারে, তার জন্য তাদের পরিকল্পনার ঘাটতিকে অন্য রাজ্য সরকার কীভাবে তার সমাধান করছে, তার প্ল্যান ও প্রোগ্রাম নিয়ে নিজের সরকারকে সেই পর্যায়ে উন্নীত করবার চেষ্টা চলছে। এই পরিকল্পনার আদান—প্রদান পদ্ধতি চলছে প্রধানত বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে। এই পদ্ধতি এখন একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। কোন্ রাজনৈতিক দল সরকার হাতে পেয়ে জনগণকে কতদূর প্রশাসনিক সুব্যবস্থা ও সার্বিক সুবিধা দিতে পারে, ভোট ও উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে তারই প্রতিযোগিতা চলছে।

রাজ্যসরকারগুলি সুষ্ঠু প্রশাসনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক প্রশাসনিক ধারণা, পরিকল্পনা বা আইন-প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক দেওয়া—নেওয়া চালাচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বিহারে জনতা দল (ইউ) ও বিজেপির যৌথ সরকার রয়েছে। বিহারের 'রাইট্ টু সার্ভিসেস্' বিলের খসড়া তৈরি করবার সময় বিহার সরকার মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে 'মধ্যপ্রদেশ পাবলিক সার্ভিস গ্যারান্টি আইন ২০১০'-এর সাহায্য নিয়েছিল। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তা না করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা ওই আইনে রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ সরকার এই সব প্রশাসনিক সংস্কার আইনের মাধ্যমে চালু করেছে। মধ্যপ্রদেশ সরকারও 'বিহার স্পেশাল কোর্টস্ আইনের' ধাঁচে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যেও তাদের বিশেষ আদালতে বিচার সুনিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন করেছে।

শিবরাজ সিং চৌহান

সুশীল মোদী

নরেন্দ্র মোদী

রমণ সিং

ছত্তিশগড়ের রাজ্য বিজেপি সরকার খাদ্য সংগ্রহ ও তার পরিবেশন সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তাতে সফল হয়েছে। ধান ও খাদ্যশস্যাদি সংগ্রহের জন্য সমবায় সংস্থাগুলিকে এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে এবং সংগ্রহ ও বিতরণের কাজগুলি তদারক করবার জন্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে সরকারের দারুণ সাফল্য এসেছে। বিহার সরকার ছত্তিশগড়ের এই মডেল প্ল্যান থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁদের মতো করে বিহারে তা প্রচলন করেছে।

মধ্যপ্রদেশ সরকার, গুজরাট সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের অভিযোগের তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান অনলাইনে যাতে করা যায়, তার পরিকল্পনা নিয়ে তাদের মতো কিছু পরিবর্তন করে তাৎক্ষণিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করেছে। উভয় রায়েই প্রতিমাসে একবার একটি নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা নিজ-নিজ রাজ্যের জেলা অফিসারদের ও বিভাগীয় সেক্রেটারীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আগে থেকে স্থির করা বিভিন্ন অভিযোগের প্রতিকারের পথ বাতলে দিচ্ছেন ও দোষী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির ব্যবস্থা করছেন। ছত্তিশগড় সরকার গুজরাট রাজ্যের বড় বড় শহরের পাশাপাশি ছোট ছোট শহর তৈরির ও উন্নয়ন পরিকল্পনা খুঁটিয়ে দেখে গুজরাটের কাছ থেকে তাদের পরিকল্পনার মডেল দেখে সেই অনুযায়ী তাদের রাজধানী রায়পুর শহরের কাছে নয়া রায়পুর শহর তৈরির পরিকাঠামো তৈরি করছে। এই ব্যাপারে গুজরাটের গান্ধীনগরই শুধু নয়, বিশ্বের অন্যান্য বড় বড় শহর, এমনকী চণ্ডীগড় শহরের মডেলেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। বড় বড় ভালো আদর্শ ও পরিকল্পনা রূপায়ণের মধ্যে রাজনীতির কোনও রং নেই। রাজনীতির সীমাকে ডিঙিয়ে এইসব জনকল্যাণের কাজ চলছে। গুজরাট থেকেও কংগ্রেস-শাসিত অন্ধ্রপ্রদেশে তাদের স্বনির্ভর পরিকল্পনার নমুনা ও ছোট ছোট আর্থিক পরিকল্পনা দেখবার জন্য একটি দলকে পাঠানো হয়েছিল। অন্যান্য রাজ্য সরকারও যে কোনও দলই হোক্ না কেন, গুজরাট সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে গুজরাট পরিদর্শনে আসছে গুজরাটের উন্নয়নপদ্ধতি দেখবার ও জানবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কোনও বামপন্থীশাসিত রাজ্য সরকার গুজরাটের উন্নয়নের মডেল পরিদর্শনের জন্য সরকারীভাবে এসেছে কিনা জানা যায়নি।

এটা পরিষ্কার বলা যায় যে, কংগ্রেস ও বিজেপি এই দু'টি জাতীয় দলের মধ্যে বিজেপি সাংগঠনিকভাবে এই পারস্পরিক আন্তঃরাজ্য পরিকল্পনার দেওয়া—নেওয়ার পদ্ধতি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে অনুসরণ করে তাদের আদর্শ ও রাজনীতির ধ্যান-ধারণাকে প্রসারিত করছে। এই দেওয়া-নেওয়ার পদ্ধতি চলছে, যে রাজ্যে তারা একমাত্র শাসন ক্ষমতায় বা অন্য দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সরকার চালাচ্ছে, এই দেওয়া-নেওয়ার কাজ চলছে, সেইসব সরকারের মধ্যেই। কংগ্রেস নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে বিশেষত তাদের হাইকম্যাণ্ডকে ঘিরে। রাজ্যগুলির ক্ষমতা পরিবর্তনের ব্যাপারে জাতীয় ভাবনাচিন্তার দিক থেকে তার কোনও কিছু করবার নেই। বিশেষ করে ২০০৯ সালে লোকসভার নির্বাচনে জেতার পর থেকে কংগ্রেস আত্মসন্তুষ্টি ও জড়ত্বে ভুগছে, কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে যেন তার কিছু করার নেই।

২০০৬ সাল থেকেই বিজেপির জাতীয় কার্যকারিণী সভায় (সাধারণত তিন মাসে একবার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে) বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের আলোচনার জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে রাখা হচ্ছে, সেই সময় তাঁরা তাঁদের রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্লজ্জ পক্ষপাতমূলক বিমাতৃসুলভ আইনসমূহের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে। এই সুযোগে প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়, কোথায় কিভাবে তাঁরা সাফল্যলাভ করেছেন, সেই সব বিষয়ও আলোচনা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গুয়াহাটিতে কার্যকারিণী সভায় ছত্তিশগড় রাজ্য সরকার খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যাপারে তথ্যপ্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে কীভাবে সাফল্যলাভ করেছে, তা দেখানো হয়। এই রাজ্যের গর্ব যে, সেখানে বিদ্যুৎসরবরাহ কখনও বিঘ্নিত হয়নি।

নীতিন গডকরি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ২০১০ সালের মে মাসে 'গুড্ গভর্ন্যান্স সেল'এর প্রতিষ্ঠা করে গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পারিকরকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। রাজ্যে রাজ্যে যাতে দক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে গত জুন মাসে মুম্বইতে 'রামভাও মহলগী প্রবোধিনী' সভার অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। বিজেপি-শাসিত রাজ্যের সব মুখ্যমন্ত্রী এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ৫৪ জন মন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। বিজেপি-শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে যে সব পরিকল্পনা ও প্রয়োগপদ্ধতির সফল রূপায়ণ করা হয়েছিল তা সবই আলোচিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সামাজিক ক্ষেত্রে শিশুকন্যাদের জন্য 'লাড্লি লক্ষ্মী' ও রাজ্য সরকারের পরিচালনায় 'কন্যাদান' (গণবিবাহ) প্রকল্প সম্পাদন করার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছিলেন।

গত বছর জানুয়ারী মাসে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলন দিল্লীতে হয়েছিল, ফেব্রুয়ারিতে উপজাতি কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রীদের সম্মেলন হয়েছিল, সেপ্টেম্বরে বিজেপির শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলন, অক্টোবরে রায়পুরে কৃষি, খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রীদের সম্মেলন হয়েছিল, নদীসংযোগ ও জলসরবরাহ বিভাগের সম্মেলন দিল্লীতে হওয়ার কথা।

রাজ্যগুলির বিষয় আলোচনা করার জন্য কংগ্রেস দলের এরকম কোনও মঞ্চ বা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা নাই, যেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বসে একসঙ্গে চিন্তার আদানপ্রদান, বা রাজ্যের সমস্যাসমূহ আলোচনা করতে পারে। ঘটনাচক্রে বা রাজনীতির প্রয়োজনে আলোচনা হয়ে থাকতে পারে। এ আই সি সি বা কার্যকরী সমিতির সভায় রাজ্যের সমস্যাগুলি আলোচনা করার জন্য কোনও সময়সূচী নির্দিষ্ট করা থাকে না। কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা কয়েকবার সম্মিলিত হলেও তা হয়েছে অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যে যুগে প্রত্যেকটি রাজ্য ক্ষমতালাভের প্রাথমিক লক্ষ্য হয়ে উঠছে এবং সব রাজ্যস্তরের নির্বাচকমণ্ডলীর মতামত একত্র করে যখন জাতীয় নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটছে, তখন বিজেপি একটি প্রধান জাতীয় দল হিসাবে মাথা খাটিয়ে তৎপরতার সঙ্গে তাঁদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার পদ্ধতিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিকতার রূপ দিয়ে কাজ করে চলেছে।

চৈতন্যচরিতামৃত-এর পটভূমি

অন্ধকারময় সামাজিক পরিস্থিতি থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ

।। সমীর চট্টোপাধ্যায়।।

বড়ই বিস্ময় বোধ হয় যখন ভাবি যে আকর বৈষ্ণবগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত যদি রচিত না হোত তাহলে শ্রীচৈতন্যের ৪৮ বছর ব্যাপী লীলা কাহিনী তথা ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদের সেই মধ্যযুগের অন্ধকারময় সামাজিক পরিস্থিতি থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের কাহিনী কিছুই জানা যেত না। একই কথা বলা যায় বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটি সম্বন্ধে। অনেকেই বলবেন— কেন বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা গ্রন্থ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায় যে এই সব গ্রন্থগুলি যদি রচিত না হয় তাহলে আমরা পৃথিবীর প্রাচীনতম সমাজের নানাদিক সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারতাম না। তবে এই গ্রন্থগুলি সময়ের ব্যবধানে এতই প্রাচীন যে ততটা বিস্ময় বোধ হয় না। যতটা হয় চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থগুলির জন্য। সময়ের বিচারে এর থেকে আরও সাড়ে তিনশো বছর পরে রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থটি সম্বন্ধে ওই একই কথা বলা যায়।

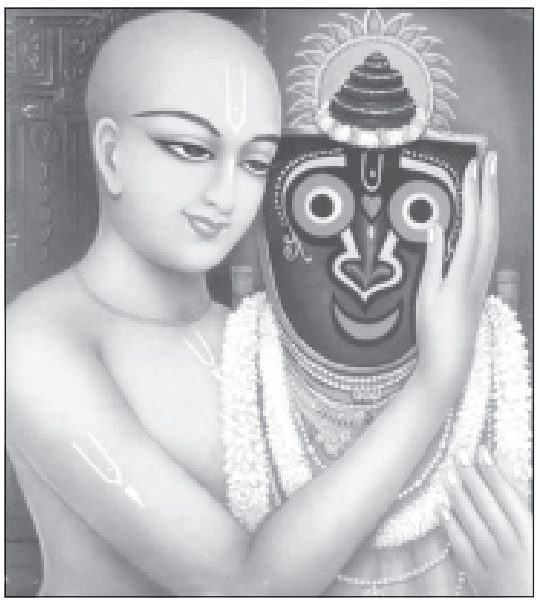

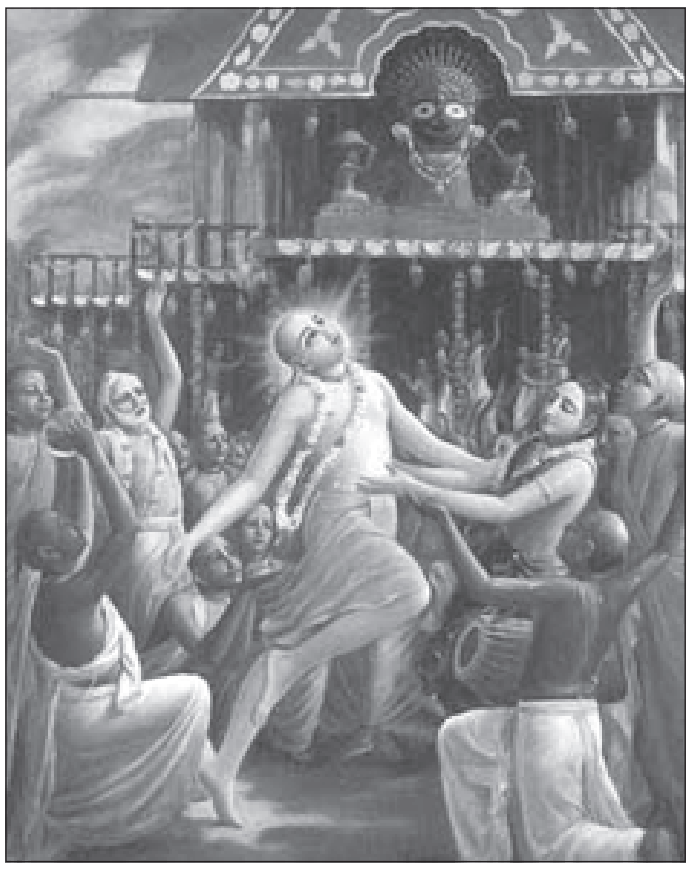

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটির রচয়িতা কাটোয়ার নিকটে ঝামটপুর বহরান গ্রামনিবাসী কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর প্রকট কালে রেল লাইন ছিল না, ছিল না কোনও রাজপথ, ছিল শুধু পায়ে হাঁটার পথ এবং জলপথ তথা গঙ্গা ও অজয় নদীর জলপথ। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী ওই গ্রন্থে নিজের গ্রাম পরিচয় দিয়েছেন— গঙ্গা তীরবর্তী নবহট্ট গ্রামের (বর্তমান কালের নৈহাটি গ্রামের কাছে ঝামটপুর গ্রাম। তখন গঙ্গা পথে নৌকায়

অথবা পদব্রজে লেখকের গ্রাম থেকে-কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা এবং নীলাচলে যেতে হোত। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী যিনি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি রচনার আগে কোনও লেখালিখির ধারের কাছেও যাননি এবং নিজেই তার রচিত গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে তার চোখের অবস্থা ভালো ছিল না, কানেও ভালো শুনতে পেতেন না, মনঃসংযোগও ঠিক করতে পারেন না, তবুও তিনি লিখে চলেছেন যাতে তিনি বড়ই বিস্ময় বোধ করতেন। কৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ করেন ১৪৯৬ খৃস্টাব্দে। তিনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। পিতা-মাতার নাম যথাক্রমে ভগীরথ কবিরাজ ও সুনন্দা দেবী। শৈশব কালেই তিনি পিতৃহারা হন। তাঁর গৃহ আঙিনার মধ্যেই রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে সেবিত হোত বংশানুক্রমিকভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ। তাই কবিরাজ কৃষ্ণদাস জন্ম থেকেই নৃত্য কৃষ্ণসেবা প্রত্যক্ষ করতেন। বাড়িতে যে রাধাকৃষ্ণ মন্দির তখনও ছিল এবং আজ এই ২০১০ খৃস্টাব্দে তা বজায় আছে, তবে

জীর্ণ ভগ্ন মন্দিরেই এখনও সেবিত হচ্ছে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ শিষ্য পরম্পরায়। কবিরাজ গোস্বামীর সময়ে পুরোহিত ছিলেন গুণার্ণব মিশ্র। বর্তমান পুরোহিত মশায় এই মন্দিরে রক্ষিত কবিরাজ গোস্বামীর জীর্ণ কাষ্ঠ পাদুকা এবং বৃন্দাবন থেকে ফেরত নিয়ে আসা চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটির হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি দর্শন করিয়েছিলেন। বর্ধমান জেলার একটি ছোট গ্রাম ঝামটপুর কিন্তু এখানেই রক্ষিত আছে যা দেশের অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাল্যকালের সেই পুরোহিত অর্থাৎ গুণার্ণব মিশ্র স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন নদীয়ার তার্কিক উদ্ধত নিমাই তথা পরবর্তীকালের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বয়সের বিচারে কৃষ্ণদাস যিনি পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জীবনী ও লীলা কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থে তিনি নদীয়ার নিমাই অপেক্ষা মাত্র দশ বছরের ছোট ছিলেন। পুরোহিত শ্রী গুণার্ণব মিশ্র রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে কৃষ্ণ সেবা করতে করতে বৈরাগ্যবান হন। তিনি শ্রীচৈতন্যের কথা যা তিনি স্বচক্ষে দেখে ছিলেন তা সবিস্তারে বলেন মন্দিরে সেবা কার্য করার সঙ্গে সঙ্গে যা অতি অল্প বয়সী কৃষ্ণদাস শুনতেন অবাক বিস্ময়ে। যতই শুনেন ততই তার হৃদয় মন্দিরে প্রশ্ন জাগরিত হয়— এসব কথা কি তালপাতার পুঁথিতে কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখছেন? এত সব সুন্দর কাহিনী যা পাঠ করে ভবিষ্যত কালের মানুষেরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা আস্বাদন করবে শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও লীলা কাহিনী এবং প্রেম সাগরে ডুবতে পারবে ভাবী কালের আপামর জনসাধারণ। নিমাইয়ের বাল্যলীলা যৌবন লীলা এক কথায় গৌর কথা শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে পড়েন কৃষ্ণদাস। আবাক হয়ে শোনেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যার পূর্ব জন্ম ছিল মথুরার শ্রীকৃষ্ণ—আত্মা একই কেবল দেহটা পাল্টানো। শোনেন আর ভাবেন শ্রীকৃষ্ণের কত না লীলা কত না মাধুরী, তখনই কৃষ্ণদাসের অন্তরে ভীত গাঁথা হয়ে যায় শ্রীচৈতন্যের জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ভাবী কালের ভারতবাসীদের গোচরীভূত করার বাসনা। ব্রজভূমি বৃন্দাবনে মদনমোহনের মন্দির তখনও ছিল, এখনও আছে যেখানে সেই কবে থেকে সেবিত হচ্ছেন— মদনমোহন তথা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ। অভিন্ন তনু নিত্যনন্দ প্রভুর কাছে গিয়ে কৃপা প্রার্থনা করলেন এবং বাসনা প্রকাশ করলেন যে তিনি (কৃষ্ণদাস) বাকি জীবন ঝামটপুর ত্যাগ করে ব্রজভূমি বৃন্দাবনবাসী হতে আগ্রহী, থাকতে চান মদনমোহনের কাছে বৃন্দাবনের মদনমোহন মন্দিরে, অবশ্য এর পিছনে সাংসারিক কারণ ছিল যাতে তিনি বিষয় বিরক্ত হয়ে সহোদরদের ত্যাগ করে ঝামটপুর থেকে চলে যেতে চেয়েছিলেন। বৈষ্ণব জগতের যড়গোস্বামীদের মধ্যে যিনি সবার পরে বৃন্দাবনে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন সপ্তগ্রামের ধনী জমিদার পুত্র এবং পরবর্তী কালের বৈষ্ণবদের কাছে নিত্য স্মরণীয় নাম— দাস রঘুনাথ। তিনি ষড়গোস্বামীদের মধ্যে ছিলেন পরম ভাগ্যবান। কেননা বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও তিনি বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর কাছে এক সাথে বিহার করেছিলেন। দাস রঘুনাথ সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট থেকে তার শ্রীমুখ মিশ্রিত নানা লীলা কাহিনী যা তৎপরবর্তীকালে ঘটে গিয়েছে প্রকট কালেই তা সব শুনেছেন। দাস রঘুনাথ এতই ভাগ্যবান ষড়গোস্বামীদের মধ্যে যে তিনি কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে থাকতে পেয়েছেন। দাস রঘুনাথ মহাপ্রভুর কাছে বসে শুনেছেন, হৃদয়ঙ্গম করেছেন ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তিম লীলার সাক্ষী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ স্পর্শ করেছেন আলিঙ্গন করেছেন অধিকার পেয়েছেন মহাপ্রভুর চরণ সেবা করার। মহাপ্রভুর কাছ থেকে শুনেছেন—সংসারের ভালোবাসার সঙ্গে শ্রীহরির ভালোবাসার তফাৎ যথেষ্ট।

ঝামটপুরের কৃষ্ণদাস যখন বয়সে যুবক তখন নিত্যানন্দ প্রভুর আদর্শে কৃপালাভ করে পদব্রজে, মতান্তরে জলপথে বৃন্দাবনে পৌঁছে আশ্রয় লাভ করেন বৃন্দাবনের মদনমোহন মন্দিরে। এই মন্দির দর্শন করতে নিত্য আসেন পাকাপাকি ভাবে বৃন্দাবনবাসী দাস রঘুনাথ। কৃষ্ণদাস সেখানে অবস্থানকালে পরিচিত হন দাস রঘুনাথের সঙ্গে। যিনি তখন বৃন্দাবনে বসবাসকারী পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত, মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে অর্থাৎ ১৫৩৪-৩৫ খৃস্টাব্দের পর। কৃষ্ণদাস তার লীলা কাহিনী প্রভুর কথা সব শুনেছেন, শুনতে শুনতে অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে মন্দিরে ভাববিহ্বল অবস্থায় বিচরণ করেন। এই মন্দির দর্শন করতে সমসাময়িককালে সব বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের নিত্য আগমন ঘটে আর দেখেন যে কৃষ্ণদাস ভাবে বিহ্বল হয়ে আছেন মহাপ্রভুর লীলা কাহিনী স্মরণ করে। এই ভাবে দেখতে দেখতে বয়স্ক বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণদাসকে বলেন— সবাই বলছেন কৃষ্ণদাস শুধু শুনছে নিজে আনন্দ সাগরে ভাসছে— যাতে আগামী দিনের মানুষরা প্রভুর অপ্রকটের পর এবং তারপরে চিরদিনের জন্য প্রভুর লীলা কাহিনী জানতে পারেন, হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, আনন্দসাগরে অবগাহন করতে পারেন তদানুরূপ কিছু লিখতে। কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবদের কথা দেন তিনি লিখবেন। কৃষ্ণদাস দাস রঘুনাথের কাছাকাছি বাস করতেন। মহাপ্রভুর কথা যত শুনেছেন, কুড়ি বৎসর ব্যাপী রাধাকুণ্ডের পারে বসে লিখেছেন। আজও এই ২০১০ খৃস্টাব্দে বৈষ্ণব পাটবাড়ী মন্দির এবং কিছু কিছু প্রাচীন বৈষ্ণবদের বাসগৃহে টাঙানো থাকা ছবিতে দেখা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাধাকুণ্ডের পারে বসে বৃদ্ধ অবস্থায় কলম ধরে লিখছেন ভবিষ্যতের অমূল্য আকর চৈতন্য জীবনী। চৈতন্য চরিতামৃত যা মহাপ্রভু সম্বন্ধে যত গ্রন্থ আছে তার মধ্যে এই গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যা বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। বেশির ভাগ বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি যা রচনা করেছেন বৃন্দাবনবাসী ষড়গোস্বামীরা তা সব সংস্কৃত ভাষায়। তাই কৃষ্ণদাসের প্রকট কালে যখন কোনও বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণদাসকে প্রশ্ন করেন— এ গ্রন্থ কেন বাংলা ভাষায় রচনা করলেন? কৃষ্ণদাসের উত্তর— মদনমোহন বলেছেন। তখনকার বেশির ভাগ ধর্মগ্রন্থ তথা বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ও ষড় গোস্বামী রচিত সমস্ত গ্রন্থই রচিত হয়েছিল দেব ভাষা সংস্কৃত ভাষায়। তখনকার বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণদাসকে বলেন, যেহেতু এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে তাই সমাদর পাবে না। এই গ্রন্থ, তদোত্তরে কৃষ্ণদাস বলেন, যিনি আমাকে এই গ্রন্থ লিখতে বলেছেন তাকেই জিজ্ঞাসা করি গ্রন্থটি রচনা করার জন্য সমাদর ও অর্থমূল্য পাবো কি না। তালপাতার উপর রচিত পাণ্ডুলিপিটি লাল কাপড়ে মুড়ে মদনমোহন মন্দিরে মদনমোহন বিগ্রহের কাছে রেখে দিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি সব গ্রন্থের নীচে রাখলেন। মদনমোহনের কাছে প্রার্থনা জানালেন— ঠাকুর তুমি পড়ে বলে দাও কোনও গ্রন্থটি ভালো। মন্দিরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা আগত। সন্ধ্যারতির সময় হয়েছে, সবাই বলছে মন্দির দ্বার খুলে দিতে। মন্দিরে দণ্ডায়মান কৃষ্ণদাস বলছেন আজ বাইরে থেকে সন্ধ্যা আরতি কর। পুরোহিত মশায় তাতে রাজি হন না, বললেন না তা হয় না। বললেন দরজা খোলো। দরজা খোলা হলো দেখা গেল চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি যা ছিল তলায় এখন সেটা সবার উপরে রয়েছে। মদনমোহন পাঠ করে উপরে রেখে দিয়েছেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মন্দিরে উপস্থিত ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। লেখক কৃষ্ণদাসের দুটি আঁখি দিয়ে তখন অবিরাম ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছে।

অন্যান্য আকর বৈষ্ণব গ্রন্থের সঙ্গে কৃষ্ণদাসের রচিত গ্রন্থের পার্থক্য কী? তার রচনার বৈশিষ্ট্য কী? সকলেই যখন যবন হরিদাস বা ঠাকুর হরিদাসের সংস্পর্শে আসা বেশ্যার (লক্ষহীরা) কথা বলেছেন, তখন কিন্তু বেশ্যার কী অবস্থা হলো হরিদাসের সংস্পর্শে এসে— কী পরিবর্তন হলো সে সব কথাই কৃষ্ণদাস রচিত গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। বেশ্যা বা বাইজি— যাই বলুল না কেন পরম বৈষ্ণবীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল পূর্বতন গ্লানিময় জীবন থেকে সরে এসে। রাত্রি দিনে তিন লক্ষ বার নাম জপ করে, তুলসী সেবন করে ইন্দ্রিয় দমন করে প্রেম পরকাশ প্রসিদ্ধ নিষ্ঠাচারী বৈষ্ণবীতে রূপান্তরিত হলেন। হলেন পরম মহতী বৈষ্ণব, তখনকার কালে বড় বড় বৈষ্ণবেরা যেতেন তাকে দর্শন করতে। আবার নবদ্বীপে থাকাকালীন শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই-মাধাই উদ্ধার করলেন যা অন্যান্য গ্রন্থ পড়ে জানা যায়। কিন্তু উদ্ধারের পর তাদের কি অবস্থা কেউ লেখেনি। লিখেছেন কৃষ্ণদাস তার চৈতন্য চরিতামৃতে—

কঠোর তপস্বী হোল জগাই মাধাই।
পরম ব্রহ্মচারী বলে খ্যাতি রটে তাই।।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করে দু'লক্ষ বার হরিনাম জপ করে এই দুই ভাই। তাই মনে হয় যে সব ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল সমসাময়িক কালে শ্রীচৈতন্যের প্রেম বিতরণে তা দিয়ে মালা গেঁথেছেন সেকালের ঝামটপুরের কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী। তাই সার্থকনামা

(এরপর ৯ পাতায়)

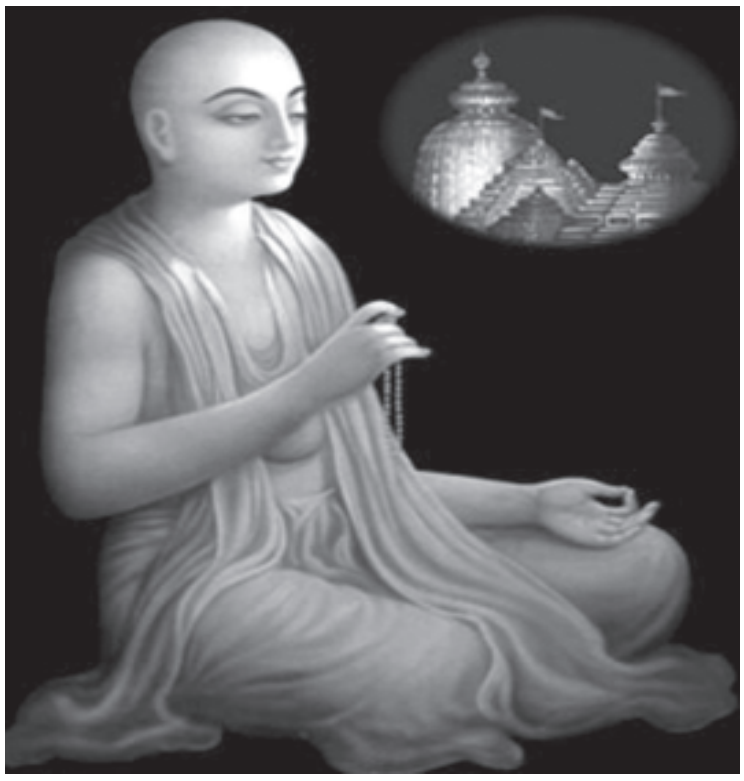

চৈতন্য—চিত্র

কণ্ঠীধারী কৃষ্ণপ্রেমে আচ্ছন্ন মনীষায় অসমসাহসী চরিত্রের সংমিশ্রণ

।। নন্দদুলাল রায়চৌধুরী।।

এই প্রবন্ধ-লেখক এক সময় পেশাদার চিত্র-শিল্পী ছিলেন। বিশেষ করে, প্রতিকৃতি আঁকায় কিছুটা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। শিল্প-শিক্ষা করেছেন বহুবছর, শান্তিনিকেতন কলাভবনের এক প্রাক্তন ছাত্রের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে। প্রতিকৃতি অঙ্কনের, বিশেষতঃ তেল রঙে প্রক্রিয়া খুবই জটিল ও তাতে দক্ষতা লাভ করা বিশেষ অনুশীলন সাপেক্ষ। পরবর্তীকালে রেলে চাকরির সুবাদে কয়েকবার ভারত পরিক্রমা করার সুযোগে বহু বিখ্যাত শিল্পীর কাজ দেখার সুযোগ হয়েছে। যেটা দেখা হয়নি তা'হল শিল্পী যামিনী রায়ের তেল রঙে আঁকা প্রতিকৃতিগুলি। লোকশিল্পে আকর্ষিত ও আত্মনিবেদন করার আগে যামিনী রায় যে ইউরোপীয় শৈলীতে তেল রঙে প্রতিকৃতি অঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে আমাদের মনীষীদের যেসব প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য আমরা দেখি, যেগুলি তাঁদের জীবদ্দশায় আঁকা হয়েছিল সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করবো না। কিন্তু যাঁদের আমরা দেখিনি অথচ তাঁরা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে প্রকীর্তিত, তাঁদের প্রতিকৃতি কিভাবে আঁকা হয় বা হওয়া উচিৎ— এ প্রশ্ন আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ক্যামেরা আবিষ্কারের আগে সারা বিশ্বে গোপালের ছবি ও সমস্ত দেবদেবীর ছবির প্রচুর চাহিদা, চাহিদা আছে নানা সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষদের ছবিরও। ওঁদের রাখা কয়েক শ' অ্যালবামে নমুনা হিসেবে লাগানো আছে এসব ছবি, তা দেখেই পছন্দমতো ছবির অর্ডার দেয় নানা ক্যালেণ্ডার ব্যবসায়ীরা। আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ছবিও পেলাম ওই অ্যালবামের একটিতে। মজার কথা, আমার মনে হলো, মস্তক মুণ্ডন করা এক সুন্দরী যুবতী মহিলার ছবি মহাপ্রভুর প্রতিকৃতি হিসেবে আঁকা হয়েছে। তাঁর অর্ধনিমীলিত আঁখি, পেলব মুখের ত্বক, প্রতিকৃতি আঁকা হতো জীবিতদের সামনে বসিয়ে। কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির প্রতিকৃতি আঁকা হতো তাঁদের জীবনেতিহাস পাঠ করে। তাঁর সম্পর্কে শিল্পী কল্পনায় যে চিত্রটি ধরতেন তাই প্রতিফলিত হোত তাঁর ক্যানভাসে। রাজস্থানের উদয়পুরে সুখাড়িয়া সার্কেলের গায়ে ভারতীয় রেলের একটি স্যাটিস্টিক ট্রেনিং কলেজ আছে। সেখানে রেলের পরিসংখ্যান বিদ্যায় প্রশিক্ষণ নেবার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছিল। শনিবার -রবিবারে কোনও ক্লাস না থাকায় আমরা একটি বাস রিজার্ভ ক'রে হলদিঘাট, শাস-বহু কী মন্দির, মহাসমন্দ লেক ও নাথদ্বারা মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। নাথদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মন্দির ও কৃষ্ণভক্তদের মহাতীর্থ হিসেবে বিখ্যাত। মন্দিরটি একটি একতলা বাড়ির মতো দেখতে, বাইরেটা কাঁচা হাতে আঁকা দেওয়ালচিত্র দিয়ে সাজানো। কোনও ভাস্কর্য নেই— খুবই সাধারণ দর্শন, মন্দির বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে মেলে না। সেখানে খবর পেলাম, নাথদ্বারার অদূরে একটি গ্রামে ক্যালেণ্ডারের ছবি আঁকার একটি বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে। আমি ও দু'একজন বন্ধু মিলে সেখানে গেলাম। যা দেখলাম, তা আমার কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। বিশাল এক কর্মশালায় অন্তত ৫০ জন শিল্পী নানা মাধ্যমে ছবি আঁকছেন নানা দেবদেবী ও মহাপুরুষদের। ওই অঞ্চলের বহু পরিবার এই কাজে বংশপরম্পরায় নিযুক্ত আছেন। ক্যালেণ্ডার ও ঘরে ঘরে যেসব দেবদেবী ও মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি আমরা দেখি তার মূল ছবিটি এখানেই আঁকা হয় ও মুম্বাই, পুণে ও চেন্নাইতে ওয়েব অফসেটে ছাপার জন্য চলে যায়। যে ধৈর্য, ডিটেল্‌স ও অলঙ্করণের সূক্ষ্ম কাজ এখানকার শিল্পীরা করেন তা অবিশ্বাস্য বলা যায়। রাধা—কৃষ্ণের নানা লীলার ছবি, বাল ও অসমসাহসী চরিত্রসম্বলিত কোনও প্রতিকৃতি আঁকা ও প্রচারিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সর্বত্রই কণ্ঠীধারী, তৃণাদপি-সুনীচেন ও কৃষ্ণপ্রেমে আচ্ছন্ন এক সাধারণ ভক্তের প্রতিকৃতিতেই তাঁকে আট্‌কে রাখা হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম শিল্পগুরু নন্দলাল বসুর আঁকা একটি প্রতিকৃতিতে আমরা প্রকৃত মহাপুরুষ চৈতন্যদেবকে পাই। দাক্ষিণাত্য পরিক্রমার পর তিনি যখন নীলাচলে এলেন জীবনের শেষ পর্বে এবং আপামর মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে বৈষ্ণব ধর্মের পতাকাটিকে আকাশে উড্ডীন করলেন, সারা নীলাচল চৈতন্যপ্রেমের বন্যায় যখন ভাসমান, তখন পুরীর রাজাও তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। তখনই ঘটলো সেই মহাপ্রলয়। নীচুজাতি, অন্ত্যজ হরিজনদের পরিজন ক'রে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভু যখন জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলেন তখন মন্দিরের পাণ্ডাকুলের প্রবল হিংস্র বাধায় তাঁর আর মন্দিরে প্রবেশ করা হ'ল না। তিনি মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সামনে স্থাপিত গরুড়-স্তম্ভের পাদদেশে ভূমিতে বসে ভগবান জগন্নাথকে দিব্যচক্ষে দর্শন ক'রে সমাধিস্থ হলেন। সেই দৃশ্যটিই শিল্পী নন্দলাল বসু তাঁর পটে ধরেছেন। উন্নত নাসা, কঠোর মুখাবয়ব, পৌরুষদৃপ্ত মেরুদণ্ড সোজা রেখে উপবেশন ভঙ্গীর সঙ্গে শিল্পী নন্দলাল মিশিয়েছেন জগন্নাথ দর্শন বঞ্চিত কিন্তু তাঁর ভক্তিভাবে আপ্লুত চৈতন্যের সমাধিস্থ অবস্থাটি। এই অতি সরল রেখায়, হাল্কা বর্ণিকালিপ্ত প্রতিকৃতিটি খুঁটিয়ে দেখলে পাওয়া যায় ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর বিপ্লবী চরিত্রের ছায়া, দেখে সম্ভ্রম জাগে, মনে হয় কত কাছের আবার কত দূরের আত্মার আত্মীয় যেন তিনি। এমন ক'রে আর কোনও শিল্পী তাঁকে ষোড়শ শতকের সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাঁর যুগপৎ সমাজ সংস্কারকের ও বৈষ্ণবীয় দর্শন চেতনার উদ্গীত অবস্থানে অনুভব করতে সক্ষম হননি। শিল্পগুরু নন্দলাল বসু তা পেরেছেন এবং তার সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তদঙ্কিত প্রতিকৃতিটিতে যা' দেশের আর কোনও শিল্পীর তুলিতে চিত্রিত হয়নি—এটাই বিস্ময়ের কথা। মনে আছে 'ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব' চলচ্চিত্রে তখনকার সুদর্শন নায়ক প্রদীপ বটব্যাল নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর চেহারাটি শ্রীচৈতন্যের কল্পিত অবয়বের সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছিল। তিনি এই ছবিটিতে অভিনয় ক'রে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

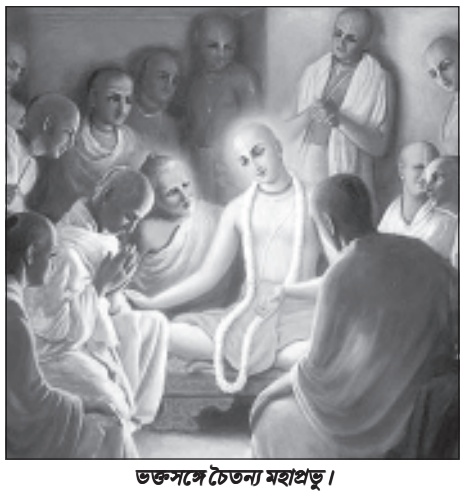

ভক্তসঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভু।

কীর্তনানন্দে শ্রীচৈতন্য।

চৈতন্যচরিতামৃত-এর পটভূমি

(৮ পাতার পর)

পুরুষ লিখেছেন—

কিছু কিছু পদ লিখি যদি তাহা দেখি
প্রকাশ করহে লীলা
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ পাঠে দরবিবে শীলা
বৈষ্ণব চূড়ামণি কৃষ্ণদাস গুরুর আদেশে দাস রঘুনাথের কাছে শুনে চৈতন্য-চরিতামৃত লিখেছেন— তাই তো গ্রন্থ সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী বৈষ্ণবদের কাছে ও সমগ্র গৌরভক্ত ভারতবাসীদের কাছে তো বটেই, তদুপরি বর্তমানকালে ইস্কনের প্রচারে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে পরম শ্রদ্ধার গ্রন্থ রূপে পরিগণিত হয়েছে আকর চৈতন্য জীবনী ও লীলা কাহিনী যেখানে বর্ণিত আছে সেই চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ।

তথ্যঋণ—(১) ঝামটপুর পাটবাড়ি বর্তমান পুরোহিত ও সেবাইতদের সহিত মন্দির দর্শনকালে ব্যক্তিগত আলাপ-চারিতা। (২) কলিকাতা বিডন-স্ট্রিটের কৈলাশ আশ্রম হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' দশম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ১৩৯৬।

'অনুপ্রবেশের নয়া চাল'

স্বস্তিকা'কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে, ভারতের ও ভারতবাসীদের ভবিষ্যত গুরুতর বিপদ সম্পর্ক তারা সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন মূল্যবান সম্পাদকীয়তে (১.১১.১৪১৭)। ভারতবাসীর সরলতার সুযোগ নিয়ে, ভারতের ইতিহাস বিকৃত করে এবং বিদেশীদের স্বার্থে পরিচালিত আমাদের দেশের অনেক প্রচার মাধ্যম বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, 'তারা (সাধারণ মানুষ) সহজেই মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা টাকার কাছে আত্মসমর্পণ করছে' (আমার নতুন জন্ম, পৃঃ ৯৪)। আমরা জানিনা আমাদের দেশের সংবাদ মাধ্যম বাইরে 'থেকে আসা টাকার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে' কিনা। তবে ভারতীয় সভ্যতা—সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা, অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করে ভারতবাসীদের ভারতবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়া সর্বদাই চলছে তাতে সন্দেহ নেই। আমরা জানি ভারতীয় সাংস্কৃতিক শক্তির বিরোধী হলো পাকিস্তান-আফগানিস্তানের ধর্ম-সংস্কৃতি অথবা নাগাল্যাণ্ড-মিজোরামের খৃস্টানি ধর্ম-সংস্কৃতি। ৮৫০০ বছরের প্রাচীন ভারতের এই সভ্যতা মুছে দিয়ে মুসলিম ও খৃস্টান রাষ্ট্র ও সেমেটিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। হাজার বছর ধরে ভারতবাসীর দারিদ্র্য দূর করতে পারেনি খৃস্টান মিশনারীরা। যা তারা করেছে তা হলো অনেক জায়গায় (যেমন নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও মেঘালয়) থেকে হিন্দুধর্ম বিলোপ করা। এবং খৃস্টান প্রধান রাজ্য সৃষ্টি করা। অর্থাৎ নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও মেঘালয় হয়েছে খৃস্টানদের রাজ্য। একদা যেখানে ছিল ভারতীয় ধর্মাবলম্বীদের বাস।

ইসলাম ও খৃস্টান বাইরে থেকে ভারতে এসে ভারতবাসীদের ধর্মান্তরিত করেছে। অনুপ্রবেশকারীরা চেষ্টা চালাচ্ছে এই প্রাচীন দেশের ধর্ম ও সভ্যতা বিলোপ করতে। ভারত অভিযান করেছে মুসলমানেরা। শুরু ৬৩৬-৬৩৭ সালে এখনও সেই সামরিক আক্রমণ, লুঠ ও ধ্বংস চলেছে। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর অশান্ত হয়েছে মুম্বাই। মুসলিম অভিযান বা জেহাদ যেমন চলে তেমনি চলে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ। যত বেশি সংখ্যায় ইসলামে ধর্মান্তরিত করা যাবে ততই ভারতে মুসলিম প্রভাব বাড়বে। আবার এভাবে রাষ্ট্র দখল করতে পারলে হিন্দুদের মুসলিম করা বেশি সহজ হবে রাষ্ট্রশক্তিকে ধর্মান্তরকরণের কাজে প্রয়োগ করে। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে মুসলিম রাষ্ট্র তৈরি হবে এবং ভারতীয় ধর্মালম্বী হিন্দুকে উদ্বাস্তু হতে হবে। এই চিন্তা বহু হিন্দুর মধ্যেই নেই। সুতরাং আমাদের কর্তব্য ঃ

(১) 'অনুপ্রবেশের নয়া চাল' বার বার প্রকাশ করা।

(২) ধর্মনিরপেক্ষ অভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা আইন তৈরি ও প্রয়োগ করা। ১৯৮২ সাল থেকে চীন সাংবিধানিক পরিবার পরিকল্পনা আইন (ধারা নং ২৫ ও ৪৯) প্রয়োগ করেছে। ফলে চীনের ভূখণ্ড মুসলিম রাষ্ট্র তৈরি সম্ভব হবে না বলে মনে হয় যদিও ভারতবাসীর জমিতে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে।

(৩) হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের লোককে জানাতে হবে ১৯৯১—২০০১ সালে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২৯.৩ শতাংশ, হিন্দু বৃদ্ধি ২০ শতাংশ এভাবে চলতে থাকলে ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়ে অন্য কি হতে পারে?

—ডঃ কৃষ্ণকান্ত সরকার, দমদম পার্ক, কলকাতা।

সংরক্ষণ

ভারত স্বাধীন হবার পর গণপ্রজাতন্ত্র গঠিত হলে নিম্নবর্ণের পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষা এবং আর্থিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংরক্ষণ প্রথা চালু করা হয়। এছাড়া প্রশাসনিক স্তরে নিম্নবর্ণের মানুষদের আনার জন্য লোকসভা এবং বিধানসভা ইত্যাদি ভোটে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে সংবিধানে দশ বছরের জন্য এই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে নথিভুক্ত করা হয়।

সংরক্ষণের সুবিধায় পাওয়া চাকুরিজীবীর পরিবারকে তৎক্ষণাৎ সংরক্ষণের আওতা থেকে বাদ দিলে অন্য পরিবারের মানুষ চাকুরী পেয়ে উপকৃত হোত। ভেবে দেখুন তপশিলী জাতি বা উপজাতি শ্রেণীভুক্ত কোনও মানুষ জেলাশাসক হলেন। তখন সেই মানুষটি আর্থিক দিক দিয়ে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের সমকক্ষ হয়ে পড়েন। তাহলে তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সংরক্ষণের সুবিধা আর কেন পাবে? এটা সংরক্ষণের এক ভয়াবহ ত্রুটি।

অপ্রিয় হলেও সত্য তপশিলী জাতির মানুষের মধ্যে মণ্ডল পদবীধারীরা আর্থিক দিক এবং শিক্ষায় অন্যদের থেকে এগিয়েছিল। একারণে অন্যদের টপকে এরা সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা অধিকার করে। তার ফলে লোহার, বাউরি, মুচি, মেথর, ডোম, খয়রা ইত্যাদি বর্ণের মানুষেরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রইল। এই ভুলটুকু থাকার জন্য সমাজে সংরক্ষণের সুবিধা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল না। সংখ্যালঘু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটবে।

সংরক্ষণের সুবিধা দিয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঠিক হলেও চাকুরিক্ষেত্রে সংরক্ষণ থাকা উচিৎ নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে মেধা এবং যোগ্যতা একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিৎ। নাহলে আমরা নিম্নমানের সব ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ পাব। এবং যারা প্রকৃত অর্থে যোগ্য, তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলেই কিছু মানুষ বিপথে যাচ্ছে নতুবা দেশবিরোধী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছে। কিভাবে এটা আটকাবেন?

সংরক্ষণের অমানবিক দিকটি হলো হতদরিদ্র মানুষ যার সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে, মাথার ছাদ ফুটো, বৃষ্টির জল, সূর্যের আলো এসে পড়ছে। পরিবারের একজন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। সে বাড়ীর মেধাবী ছেলেটি টিউশনি করে রোজগার করে কলেজে পড়ছে। অথচ সেই পরিবার কোনও সরকারী সাহায্য পায় না। সেই ছেলেটি সংরক্ষণের সুবিধা পায় না কারণ তারা নিম্নবর্ণের মানুষ মানুষ নন। এ কেমন সংরক্ষণ প্রথা?

তাহলে বোঝা যাচ্ছে এদেশে সংরক্ষণ আশীর্বাদ না হয়ে আজ অভিশাপ হয়েছে। তবুও ভোটের রাজনীতির জন্য সংরক্ষণ প্রথা আজও রয়ে গেল। বরং দিনে দিনে সংরক্ষণ প্রথা ক্রমশ জটিল হচ্ছে। ও বি সি এবং সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী, দেশভাগ কিন্তু সম্প্রদায় ভিত্তিতে সংরক্ষণ প্রথার বিষময় ফল।

তাই জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নয় সংরক্ষণ হোক শুধুমাত্র গরিব মানুষের জন্য। প্রত্যেক দলের দেশপ্রেমিক এবং চিন্তাশীল মানুষদের এবিষয়ে ভাবার সময় এসেছে।

—প্রশান্ত কর, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

পাকিস্তানে মহিলাদের মৃত্যুদণ্ড

পাকিস্তানে মহিলারা বিশেষত সংখ্যালঘু মহিলারা যে অবর্ণনীয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সে দেশের আইন—কানুন ও সংবিধান মধ্যযুগীয় বর্বর রীতি—নীতির উপর ভিত্তি করে হয়েছে রচিত, যা শরিয়তী আইনরূপে স্বীকৃত। আর এই শরিয়তী আইনের গাড্ডায় পড়ে মহিলারা হারিয়েছে তাদের সম্ভ্রম, বাক্—স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ন্যূনতম নাগরিক অধিকার। সেদেশে মহিলাদের জন্য এমন অমানবিক আইন রচিত হয়েছে যে কোনও মহিলা ধর্ষিতা হলে ধর্ষণের প্রমাণ দিতে হবে সেই মহিলাকেই। কিন্তু সমাজ, নিরাপত্তা ও মানহানির ভয়ে মহিলাদের পক্ষে এই প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে এর সুযোগ নেয় পুরুষরা। রিপোর্টে প্রকাশ, পাকিস্তানে নারী ধর্ষণ এক সংক্রামক ব্যাধিতে হয়েছে পরিণত। এখানেই শেষ নয়। ইসলামে পূর্ণ বা প্রাপ্তবয়স্ক ও অবিবাহিত পুরুষ বা নারীর মৃত্যু হলে সে জান্নাত (স্বর্গ) বাসী হবে না, তার ঠাঁই হবে দোজখে (নরকে)। তাই কোনও প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী নারী কোনও অপরাধে আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে জেল বা কারাগারে বন্দি ওই নারীকে কারারক্ষীরা ধর্ষণের মাধ্যমে তার কুমারীত্ব নষ্ট করে তাকে জান্নাতবাসী হওয়ার সুযোগ করে দেয়। আর এ ভাবেই পাকিস্তানে বন্দিনীরা হয় পুলিশ বা কারারক্ষীদের ধর্ষণের শিকার, সে ক্ষেত্রে বিবাহিতা মহিলারাও রেহাই পায় না রক্ষকদের লালসার হাত থেকে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে মহিলা-পুলিশ নেই এবং অবিবাহিত থাকাটা ইসলাম বিরোধী।

গণধর্ষণের শিকার মুখতারণ মাই

তবে এতক্ষণ ইসলামের রীতি—নীতি বা শরিয়তী আইন নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিত পাকিস্তানের সাম্প্রতিক একটি ঘটনা। আর ঘটনাটি হলো—পাকিস্তানের এক আদালত সম্প্রতি এক খৃস্টান মহিলাকে পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে। আর তাই নিয়ে উত্তাল পাক-পাঞ্জাবের জনপ্রতিনিধি সভা। সভার স্পিকার সংখ্যালঘু জনপ্রতিনিধিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করায় প্রতিবাদে তাঁরা ওয়াক আউট করেন। খৃস্টান ওই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ধর্মদ্রোহী, তিনি ঈশ্বর নিন্দা করেছেন। এর শাস্তি হিসেবে পাঁচ সন্তানের জননী আশিয়া বিবিকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার ফতোয়া জারি করেছেন ওই প্রদেশের একটি নিম্ন আদালত। এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। পাকিস্তানে অমুসলিমরা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তারা তারা ইসলামের অমানবতার শিকার। মান-সম্মান নিয়ে সেদেশে তাদের বসবাসও কষ্টদায়ক। এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক দেশগুলিই পারে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করে তার বর্বর আইনের পরিবর্তন ঘটাতে। ইসলামের বর্বরতা বহু প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে করেছে ধ্বংস। বিশ্বশান্তির পরিপন্থী ইসলামকে তাই প্রতিহত করা একান্ত জরুরি।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

ধর্মীয় ঔপনিবেশিকতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বিশ্ব সমাজবাদ, পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদ ও ন্যাৎসীবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ককটেল ছিল। এবং এই সকল তত্ত্বের (Ideology) নেতৃত্ব দিয়েছিল যথাক্রমে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড—ফ্রান্স, জার্মানি ও ইত্যালি। কিন্তু যুদ্ধের যবনিকাপাত করে আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তারপর আমেরিকা নেতৃত্বাধীন 'মিত্র শক্তি'র জয়-জয়াকারের মাধ্যমে বিশ্বে গণতন্ত্রের প্রবল পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সোভিয়েতের তৎকালীন স্টালিন জার্মানীর হিটলারের সাথে Non-Aggression part বা অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে কম্যুনিজম টিঁটিয়ে রাখতে সক্ষম হলে পরবর্তী বিশ্ব সোভিযেত বনাম আমেরিকা অর্থাৎ সমাজবাদ বনাম পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্রে বিভক্ত হয়। এর পরিণতিতে cold-war বা ঠাণ্ডাযুদ্ধ শুরু হয়ে বিশ্ব 'ডান-বাম' দুটি শিবিরে দ্বন্দ্বত্বে বিভক্ত হয়ে যায়। ইমিধ্যে ভারত স্বাধীন হয়ে চীনের সাথে Non-Align Movement বা নির্জোট শিবির তৈরি করে এক পরবর্তীতে সার্ক। উল্লেখ্য, সোভিয়েত নেতৃত্ব চীনের কাছে অচ্ছ্যুৎ হয়েছিল। এই তিন শিবিরের বাইরে ছিল ও পি ই সি অর্থাৎ আরব দুনিয়ার পেট্রোলিয়ামের দেশ। কিন্তু শক্তিভারসাম্য Balance of Power নীতির জন্য এই 'ডান-বাম' শিবিরের বাইরে কেহই কি নির্জোট দেশ বা আরব ভূখণ্ড নিজেদের কৌলিন্য বজায় রাখতে না পেরে ন্যাটো বা ওয়ারশ ভুক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে ঠাণ্ডাযুদ্ধ শেষ পর্যায় নক্ষত্র-যুদ্ধ (tar War) প্রস্তুতি পর্যন্ত পৌঁছায়।

সেই সময় বিশ্বে সোভিয়েত—আমেরিকার পেশী আস্ফালন ইরান-ইরাক-আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের যুদ্ধে দেখা গিয়েছিল, সেখানে একেকটা দৈত্য তৈরি করা হয়েছিল যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে পুনরায় বোতলবন্দী করার জন্য। সমস্যা এইখান থেকেই নতুন করে শুরু হলো। ইতিমধ্যে সোভিয়েতের পতনের পর আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স তথা ন্যাটো (uper Power হয়ে উঠল এবং তাদের পূর্বে তৈরি করা Puppet Govt.) পুতুল সরকার নিয়ে বেশ ভালোই দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু গোল বাধলো আল কায়দার পেন্টাগন—ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের আক্রমণে অর্থাৎ বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ বনাম বিশ্বায়নের দ্বন্দ্বে। আফগানিস্তান-পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই নয়া মৌল সন্ত্রাসবাদ তার শক্ত জমি খুঁজে পেয়েছে (আরব ভূখণ্ড বা ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন দ্বন্দ্ব বাদ দিয়ে) এবং কাশ্মীরকে নয়া দ্বন্দ্বের মোড়কে জড়িয়ে। কিন্তু আল কায়দাকে দমন করতে গিয়ে পাকিস্তানকে সহযোগী করে কাছে রাখা আমেরিকার কাছে সাপের ছুঁচো গেলার মতো। না পারবে বিশ্বাস করে কাছে রাখতে—না পারবে দূরে সরিয়ে রাখতে, কেননা তাতে তার পরমাণু অস্ত্র ভাণ্ডার বেহাত হবার আশঙ্কা থাকবে। এই পরিস্থিতির মধ্যে টিউনিসিয়া, মিশরসহ আরব ভূখণ্ডে আমেরিকার মৌরসীপাট্টা যেতে বসেছে—একের পর এক সরকার বিরোধী আন্দোলনের জেরে। মিশরের সর্বশেষ ঘটনা—আন্দোলনে সেনা অংশগ্রহণ—কেবল আমেরিকাই নয়, সারা বিশ্বকেই দোলাচলের মধ্যে রেখেছে—দেশটা গণতন্ত্রের দিকে যাবে না পাকিস্তানের জন্য ইসলামী মৌলবাদের দিকে যাবে। যদি দ্বিতীয়টা সত্য হয় তবে যেভাবে মিশরে 'আরব শিশুর কান্না' সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে একদা আরব ভূমিতে ব্রাত্য ধর্মীয় মৌল সন্ত্রাসবাদ এক বিস্তৃত পেট্রো-ডলারের আচরণভূমি পাবে। আর, তাই হবে আগামী দিনের নয়া শক্তি ভারসাম্য (Balance of Power)। আবার এই কান্না আরব দুনিয়া পার করে এক নয়া—ঔপনিবেশিক ধর্মীয় কান্নায় যে পরিণত হবে না বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধোত্তর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তার গ্যারান্টি কোথায়? সেইজন্য আমেরিকা সহ ভারত বা অন্যান্য প্রাচীন রাষ্ট্রগুলিকে এই আসন্ন নয়া ধর্মীয় ঔপনিবেশিকতাবাদের 'সামঞ্জস্য' নীতি নির্দ্ধারণ করে চলতে হবে, নতুবা আজকের আরব শিশুর কান্না গণতন্ত্রের বুকে শক্তিশেল বসাবে।

—শিবাশীষ রায়চৌধুরী, ধুবুলিয়া, নদীয়া।

বনেদী বাড়ির দোল

নবকুমার ভট্টাচার্য

দোলযাত্রা বা হোলি ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন বসন্তোৎসব। ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্দশীর রাতে 'মেড়াপোড়া' বা 'বুড়ির ঘরপোড়া'র মধ্য দিয়ে এই উৎসবের প্রথম পর্বের সূচনা। পরদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমার ভোররাতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহযুগলকে দোলায় বসিয়ে আবীর কুঙ্কুমে রাঙিয়ে 'দেবদোল' অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়পর্ব।

মদনমোহনের দোল উৎসব কোচবিহারের মানুষের প্রাণের উৎসব। এ যেন এক মিলনমেলা। শোনা যায় ষোড়শ শতকের কোনও এক সময়ে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ অসমীয়া বৈষ্ণবগুরু শঙ্করদেবের প্রভাবে মদনমোহনের পুজো আরম্ভ করেন। অবশ্য রাজপরিবারের কুলদেবতা হচ্ছেন মা ভবানী। যদিও মদনমোহনই আজ উচ্চ আসনে আসীন। মহারাজা নরনারায়ণের আমলে পুজো শুরু হলেও মদনমোহন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ। মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজকীয় মর্যাদা ও জাঁকজমক সহকারে দোল উৎসব হয়। বর্ধমান রাজবাড়ির দোলের এককালে অন্যমাত্রা ছিল, দোলের সন্ধ্যায় দেবতাদের দোল হোত রাজবাড়ির প্রতিটি মন্দিরেই। রাধাবল্লভ মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, সর্বমঙ্গলা মন্দির, সোনার কালীবাড়ী, বিদ্যাসুন্দর মন্দির। দোলের সন্ধ্যায় দু'জন ব্রাহ্মণের একজন কোলে নিতেন রাধাকে, অন্যজন কৃষ্ণকে। ব্রাহ্মণদের ধুতির খুঁটে বাঁধা থাকত আবীর। কাঁসর ঘণ্টার তালে নেচে নেচে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিতে রঙ মাখানো হোত। আবীর ছড়ানো হোত মন্দির চত্বরে। নিজেদের মধ্যে দোল খেলা না হলেও দেবতাকে দোল দেবার জন্য দোলের সকাল থেকেই মন্দিরে ভক্তদের ভিড় জমে যেত। রাজবাড়ির দোলের প্রসাদের যথেষ্ট বিশেষত্ব ও বনেদীয়ানা ছিল। রাজবাড়ির ভিয়েনখানা, রসুইখানায় বানানো হোত অঢেল মালপোয়া, রাবড়ি, দরবেশ ও লাড্ডু। ওই সঙ্গে অন্নভোগ হোত। শহরের প্রত্যেক প্রজাই পেট ভরে এই প্রসাদ খেতেন। বর্তমানে রাজ-এস্টেটের আয়, লোক লস্কর না থাকায় ৫২ পদের অন্নভোগ আর হয় না। দোল উৎসবের সে প্রাচুর্যও আজ আর নেই। মহিষাদল রাজবাড়ীর দোল উৎসবের ধূমধাম এককালে ছিল। গোবিন্দজীর বিগ্রহ ঘিরে দোল উৎসবে সেখানেও ছিল প্রাচুর্য। আজ তা আর নেই।

কলকাতার লালমোহন শেঠের পরিবারে দোলখেলা ছিল উৎসবের মতো। হোলির দিন লালমোহনের দীঘি লাল হয়ে যেত। আবির বিক্রীর বাজার বসাতেন লালমোহন। সেটাই পরবর্তীতে রাধাবাজার। কলকাতার লালদীঘির পাশে সাবর্ণ চৌধুরীদের দোলমঞ্চ ছিল। কিছু লোক গোবিন্দের পক্ষে আর কিছু লোক রাধার পক্ষে হয়ে দোল খেলত। দীঘির জলে আবীর গুলে পিচকারি মারা হোত। এতে দীঘির জল লাল হয়ে উঠত। এজন্যই নাকি ওই দীঘির নাম হয়ে গিয়েছিল লালদীঘি।

কলকাতার লাহাবাড়িতে দোল হোত দু'দিন। একদিন দোলপূর্ণিমায়। পরেরটা পাঁচদিন ধরে পঞ্চমীদোল। ছাতুবাবু, লাটুবাবুদের বাড়িতেও দোল খেলা হোত। পুজোর উপকরণ ছিল সিদ্ধি, হরিতকী, তিল, মধু, আবীর, অভ্র, কুমকুম, ফুল, ফুটকড়াই, মুড়কি, মট, দই, সন্দেশ, কলা। সত্যবালার খেমটা নাচ হোত। দোলের সময় ছাতুবাবু, লাটুবাবুদের বাড়িতে শ্রীধরজিউ, মহাদেব জিউয়ের সেবা হোত। শোভাবাজার রাজবাড়ীর নবকৃষ্ণদেব বাহাদুরের বাড়ীতেও বিগ্রহের দোল উৎসব হয়।

পরম্পরা

ষোড়শ মহাজনপদ
গান্ধার

গোপাল চক্রবর্তী

ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম, গান্ধার সুপ্রাচীন কাল থেকেই সুপ্রসিদ্ধ। বর্তমান পাকিস্তানের পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি জেলা নিয়ে গান্ধার গঠিত হয়েছিল। ঋগ্বেদে (১.১২৬.৭) ও অথর্ববেদ (৫.২২.১৪)-এ গান্ধারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ-এ গান্ধার দেশের নৃপতি নগ্নজিৎ ও তদ্‌বংশীয় স্বর্জিতের কাহিনী বিবৃত রয়েছে। রাজা বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা যযাতির দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন। শর্মিষ্ঠা, দ্রহ্য, অণু ও পুরু এই তিন পুত্রের জননী হন। দ্রুহ্যর প্রপৌত্র গান্ধারের নামানুসারেই গান্ধারদেশ খ্যাত হয়। মৎস্যপুরাণে এই কাহিনী পাওয়া যায়। গান্ধারের পিতার নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকম।

রামায়ণ অনুসারে রাজা দশরথ গান্ধারের নিকটবর্তী কেকয়রাজের কন্যা কৈকেয়ীকে বিবাহ করেন। পরবর্তীকালে রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে বসলে কেকয়রাজ যুধাজিৎ তাঁকে গান্ধারদেশ জয় করার জন্য অনুরোধ করেন। রামচন্দ্রের আদেশে ভরত গান্ধার অধিকার করেন। ভরতের দুইপুত্র পুষ্কর ও তক্ষ গান্ধারে রাজত্ব করায় তাঁদের নামানুসারে তাঁদের রাজধানী পুষ্করাবতী ও তক্ষশীলা নামে পরিচিত হয়। মহাভারতে গান্ধারের রাজা সুবলের কাহিনী পাওয়া যায়। সুবলের কন্যা গান্ধারী কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী ছিলেন।

অর্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয় দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। তিনি গান্ধারভুক্ত তক্ষশীলা জয় করেন। আনুমানিক ৬০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে গান্ধারের সালাতুরে অষ্টাধ্যায়ী রচয়িতা পাণিনী জন্মগ্রহণ করেন। ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধে গান্ধার পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পারস্য সম্রাট প্রথম দারায়ুস (আনুমানিক খৃস্ট পূর্বাব্দ ৫২২—৪৮৬)-এর বহিস্থান শিলালেখে (আনুমানিক খৃস্ট পূর্বাব্দ) অখয়মেনীয় সাম্রাজ্যের অধীনে গদারের (গান্ধার) উল্লেখ পাওয়া যায়। পেরসেপোলিস---এর দক্ষিণ কবর শিলালিপিতেও অখয়মেনীয় নৃপতির অধীন গান্ধারের উল্লেখ আছে। এই লেখাটি খুব সম্ভবতঃ অর্তক্সেরক্সেস-এর (খৃঃ পূঃ ৪০৫-৩৫৮)। তৃতীয় দারায়ুস-এর রাজত্বকালে গান্ধারের উপর অখয়মেনীয়দের আধিপত্য অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। ম্যাসিডনরাজ দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারত পুষ্করাবতী, তক্ষশীলা, গান্ধার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে খণ্ডিত ছিল। এর অব্যবহিত পরেই এই সমস্ত রাষ্ট্র ক্রমে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাচীন বৈদেশিক লেখকরা গান্ধারের যে সীমা উল্লেখ করেছেন তা এইরূপ— উত্তরে সোয়াত ও বুনেরের পাহাড়, দক্ষিণে কালবাগের পাহাড়, পূর্বে সিন্ধু নদ এবং পশ্চিমে লমখান ও জালালাবাদ। কিন্তু ভারতীয় লেখকদের মতে পূর্বে কোনও কোনও সময়ে গান্ধারের বিস্তৃতি অনেক বেশি ছিল। গান্ধারের রাজধানী হিসাবে তিনটি নগরী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। পুষ্কলাবতী বা পুষ্করাবতী, পুরুষপুর ও তক্ষশীলা। প্রথম দু'টি সিন্ধুনদের পশ্চিমে এবং শেষোক্তটি সিন্ধুনদের পূর্বে অবস্থিত ছিল। সম্ভবত অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম গান্ধারে প্রসারিত হয়।

হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশে ভারতবর্ষের প্রবেশ পথে অবস্থিত হওয়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গান্ধারকে বহু বৈদেশিক আক্রমণের আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রথমে

ইন্দো-গ্রীকরা, তারপর শকরা এবং সবশেষে কুষাণরা গান্ধারে আধিপত্য বিস্তার করে। বিদেশীরা এখানে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। খরোস্টি লিপি থেকে জানা যায় যে এই সময়ে গান্ধারে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ সৌধ নির্মাণ হয়। ''মিলিন্দ পঞ্হ'' গ্রন্থের মতে ইন্দো-গ্রীক রাজা মেনানদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। থেওদুরস নামে জনৈক গ্রীক সোয়াত উপত্যকায় বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের উপর স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে শকরাজ মাওয়েসের রাজত্বকালের তারিখযুক্ত একটি তাম্রলিপিতে ক্ষত্রপপুত্র শকপতিক কর্তৃক তক্ষশীলায় শাক্যমুনির দেহাবশেষ প্রতিষ্ঠা ও সংঘারাম নির্মাণের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

আফগানিস্তানে এমনকি আরও দূরবর্তী মধ্য এশিয়াতে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে এই সকল বৈদেশিক শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় গান্ধার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এই অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তির নিদর্শন এখনও প্রচুর। সাধারণত এগুলির নির্মাণকাল খৃস্টীয় ১ম থেকে ৫ম শতক। অবশ্য এর কিছু কিছু পূর্ববর্তী কালেরও হতে পারে। প্রত্নকীর্তি সমৃদ্ধ স্থানগুলির মধ্যে জালালাবাদ, হাড্ডা এবং বামিয়ান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বুদ্ধমূর্তি হিসাবে স্বীকৃত ছিল (উচ্চতা প্রায় ৫০ মিটার)। পরিতাপের বিষয় সম্প্রতি বর্বর তালিবানদের হিংস্র আক্রমণে এই বিস্ময়কর পুরাকীর্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

সমসাময়িক উত্তর-পশ্চিম ভারতের সৌন্দর্যবোধ এবং শিল্পরূপ ও রীতির দ্যোতক গান্ধারশিল্প ভারতীয় এবং যবন (গ্রীক) সংস্কৃতির মিলনের স্থায়ী নিদর্শন। আপন স্বাতন্ত্র্যে ও বৈচিত্রে বিকশিত গান্ধার কলায় বৌদ্ধ আদর্শ, কিংবদন্তি ও মূর্তিতত্ত্বের সঙ্গে যবন কলা প্রকরণ ও ভাস্কর্যশৈলীর অপূর্ব সমন্বয় হয়। বুদ্ধ প্রতিমার দেহ গঠনে বাহ্যত যবনরীতি সুস্পষ্ট কিন্তু এতে ভারতীয় ভাবাদর্শ-সম্মত মহাপুরুষের সর্বাধিক লক্ষণও বর্তমান। বহিরঙ্গে বিদেশী হলেও মূর্তিগুলির আত্মা ভারতীয়ই। সুদীর্ঘ চারশ বছরের অধিক সময় ধরে অফুরন্ত সৃষ্টিক্ষম গান্ধার শিল্পীগোষ্ঠী বৌদ্ধ গ্রন্থাদি ও জনশ্রুতি থেকে আহৃত বুদ্ধদেবের জীবনীকে জন্ম থেকে মহানির্বাণ পর্যন্ত রূপ দিয়েছে অজস্র ভাস্কর্য কীর্তিতে। বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তিরাজির ধ্বংসাবশেষে গান্ধার পরিপূর্ণ। গুপ্তযুগে ফা-হিয়েন সমৃদ্ধশালী গান্ধারকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আবার হর্ষবর্ধনের সময় হিউয়েনসাঙ গান্ধারকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন পরিত্যক্ত, জনশূন্য, ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায়। তবে হিউয়েন সাঙ তাঁর বিবরণে প্রায় শতাধিক অবৌদ্ধ মন্দিরের কথাও উল্লেখ করেছেন। মন্দিরগুলির মধ্যে পো-লু-ষের উত্তর-পূর্বে একটি উচ্চ পর্বতের পাদদেশে মহেশ্বরের মন্দির এবং পর্বতস্থ ভীমাদেবীর এক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন স্বয়ম্ভুমূর্তি এবং মন্দির বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রীক লেখক হেরোডোটাস্ এবং হেক্টায়সের বিবরণে গান্ধারের কথা বহুবার উল্লেখিত হয়েছে।

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট

নীল উপাধ্যায়

পেশা-প্রবেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রের বিভিন্ন চাকরির দরজা খোলা রয়েছে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান। ভর্তি হওয়ার সময় থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত রোগীর চিকিৎসায় যুক্ত থাকে বহু বিভাগ। যে কোনও একটি বিভাগের সামান্যতম ভুলই ঘটিয়ে দিতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। তাই সর্বক্ষেত্রে সদা সতর্কভাবে কাজ করতে হয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগকে। প্রতিটি বিভাগের প্রয়োজনের কথা জানা, প্রতিষ্ঠানের কোন্ খাতে কত ব্যয় হবে, কোন্ খাত থেকে কতটা আয় করা যায়; কোন্ বিভাগ কী কাজ করবে তা নির্ধারণ ও তদারক করা, হাসপাতালে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ; চিকিৎসা কর্মীদের কাজ ও পরিষেবার সঠিক ব্যবস্থাপনা, প্রতিদিনের কাজের যথাযথ হিসেব, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তা ফলপ্রসূ করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ; প্রয়োজনের জিনিসপত্র সঠিক সময়ে সঠিক মানের প্রতিষ্ঠান থেকে এসে পৌঁছলো কিনা তার নজরদারি, ইত্যাকার সব রকম দায়িত্ব বর্তায় এই ম্যানেজমেন্ট বিভাগের উপরেই।

কোথায় কোথায় কাজের সুযোগ

প্রথম দিকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লিনিক বা ল্যাবরেটরিতে অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগে কাজ পাওয়া যায়। এখন তো সরকারি হাসপাতালগুলি হাসপাতাল প্রশাসক নিয়োগ করছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাইভেট হসপিটাল, নার্সিংহোম বা হেল্থ ক্লিনিকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জন করলে ম্যানেজিং ডিপার্টমেন্ট-এর চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে সুযোগ পাওয়া যায়। পেশাদারি ভাল কাজ দেখাতে পারলে ভবিষ্যতে মেডিক্যাল কলেজের ডিন কিংবা ডিরেক্টর হওয়াও কঠিন নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

মেডিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকাটা আবশ্যক নয়, তবে থাকলে বিশেষ সুবিধে। ন্যূনতম স্নাতক। হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট বা অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন-এ ডিগ্রি। ডিপ্লোমা কাজ

(এরপর ১৩ পাতায়)

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম ।। ২৭

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

নতুন চোখ

এবার অন্ধরাও চক্ষুষ্মান হবেন। গবেষকেরা প্রস্তুত করেছেন এক ধরনের কৃত্রিম চোখ-- নাম 'বায়োপিক'। চোখের রেটিনার ঠিক নিচে এই 'বায়োপিক' আটকে দেওয়া হবে। এই যন্ত্রটি ডিজিটাল ফিল্ম ক্যামেরার মতো কাজ করে চোখে প্রতিচ্ছবি গঠনে সাহায্য করে। ফলে দেখতে পাবেন জন্মান্ধরাও। শুধু দেখা নয়, রীতিমতো অক্ষর, রং আলাদাভাবে চেনা যাবে এই কৃত্রিম চোখের সাহায্যে। অতি শিগগির 'বায়োপিক' পাওয়া যাবে সারা বিশ্বে।

প্রকৃতি সংবাদ

পিঁপড়েরাও নাকি অঙ্ক জানে সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে। তারা জটিল গাণিতিক রহস্যের সমাধান খুঁজে পায়। এই নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়েছে। পিঁপড়েদের নিয়ে এই গবেষণার ভিত্তিতে তৈরি হতে পারে আগামীদিনের কম্পিউটার সফ্টওয়্যার। প্রকৃতির প্রহেলিকা এখানেই শেষ নয়। মাকড়সা জাল তৈরি করে যে পদার্থে, তা দিয়ে তৈরি হতে পারে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট। অস্ট্রেলিয়ার লাংফিসের দাঁত থেকে তৈরি হতে পারে মজবুত গাড়ির খোল। সাপের বিষ থেকে মারণ এড্স রোগের ওষুধ খুঁজতে তৎপর বিজ্ঞানীরা। প্রকৃতির আরও বহু রহস্যের উত্তর লুকিয়ে আছে আদিমতার মধ্যেই। তবে কেন মানুষ প্রকৃতি বিমুখ?

ব্যাকটেরিয়া থেকে তড়িৎ

ব্যাকটেরিয়ারা সত্যিই চিনি বা শর্করা খায় আর তা থেকে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করে। ম্যাসাচুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এরকমই এক ব্যাকটেরিয়া তৈরি করেছেন, যা ফল, চিনি, শস্য জাতীয় খাদ্যের শর্করা থেকে এক বিশেষ জৈবিক পদ্ধতিতে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করতে পারে।

হ্যাংওভারের কফি

হ্যাংওভার কাটাতে এক কাপ কফি, আর তার সঙ্গে যদি একটি অ্যাসপিরিন খাওয়া যায় তাহলে ফল মিলবে দারুণ! সাধারণত হ্যাংওভার কাটাতে মধু বা কাঁচা ডিম খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। কিন্তু কফি অনেক বেশি কার্যকরী। কারণ, কফির মূল উপাদান ক্যাফিন অ্যালকোহলের নেশা কাটাতে, মাথা ঝিম ঝিম করা কমাতেও সক্ষম। সম্প্রতি 'জার্নাল অব্ হেডেক পেন'-এ এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

শিক্ষক ঃ একটা ভঙ্গুর জাতীয় পদার্থের নাম কর।

ছাত্র ঃ মিগ-২১ বিমান, স্যার।

□ □ □

বিচারক ঃ এই ক'বছর আগেও একটা টিভি চুরি করে জেলে গেলে। আবার চুরি করেছ--তোমার লজ্জা করে না?

চোর ঃ কী করব হুজুর, আগেরটা যে সাদাকালো ছিল।

□ □ □

ধ্যানস্থ শিব ঃ আমার ষাঁড়টাকে কিছুতেই ধরতে পাচ্ছি না কেন বল তো?

নারদ ঃ যেখানে চরছে সেখানে টাওয়ার নেই বোধহয়।

□ □ □

প্রথম বন্ধু ঃ না হতে পারলাম সি পি এম মনস্ক, না তৃণমূল মনস্ক--ইহজীবনে কিছুই হলো না রে!

দ্বিতীয় বন্ধু ঃ এই বাজারে এত অন্যমনস্ক হলে চলে?

□ □ □

অধ্যাপক ঃ ছন্দ আর অলঙ্কারের মধ্যে তফাৎ বল।

ছাত্র ঃ স্যার, মেয়েদের অলঙ্কার দিলে সংসারে ছন্দ আসে।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। শিবরাম চক্রবর্তীর কোন্ গল্পে মাংসের সঙ্গে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছিল একটা ভ্যানিটি ব্যাগ?

২। সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'গোপন খবর' কবিতায় গড়ের মাঠে কীসের গাছ লাগাবার খবর দিয়েছিলেন?

৩। লালমোহন গাঙ্গুলির অ্যাম্বাসাডার গাড়ির রং কী--সবুজ, লাল না কালো?

৪। শ্রীযুক্ত মুলুকচাঁদ শর্মা কোন্ লেখকের ছদ্মনাম?

৫। পূর্বভারতের একটি জায়গার নামে ছিলেন এক বিখ্যাত গায়িকা। কে তিনি?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। ঠিকঠিক পিকনিক

২। বোমার গাছ

৩। সবুজ

৪। কালীপ্রসন্ন সিংহ

৫। কমলা ঝরিয়া

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছয়। চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।— সঃ স্বঃ

রেল বাজেট — ২০১১

দুর্নীতিপরায়ণ সরকার মমতার শরণে

তারক সাহা

ভোটের ঢাকের বাদ্যি মমতা বাজালেন ২৫ তারিখে ভারতীয় সংসদে। ঘটনা--রেল বাজেট ২০১১-১২। এবারের বাজেটে দেখেশুনে মনে হচ্ছে তিনি কল্পতরু। মনে হচ্ছে পি. সি. সরকারের জাদুকাঠি তাঁর হাতে রয়েছে। এবারের বাংলার রাজনীতির আবহ এমন যে তাতে অতি দুর্মুখেরও বলার সাহস নেই যে, এবার লাল বাংলায় পরিবর্তন আসবে না। সুতরাং তিন-চার মাস বাদে এ রাজ্যের শাসনদণ্ডটি যে তাঁরই হাতে তাতে কারুরই দ্বিমত নেই।

আসলে মন্ত্রীরা সংসদে বা বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করেন তার ইংরেজী পরিভাষা হলো "Budget Proposal"। এই "Proposal" কথাটার পরেই আসে "Disposal" কথাটা। অর্থাৎ প্রস্তাবের পর তা রূপায়ণের কথাটা স্বাভাবিকভাবেই আসে। একজন মন্ত্রী কেবল Proposal দেয়— Disposal করাটা অনেক সময়ে তাঁর কর্তব্যের মধ্যে আসে না বা অনেক ভালো ভালো Proposal-ও কালের বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়।

এবারের বাজেট নিয়ে মমতার কড়া নিন্দুকদেরও কিছু বলার সাহস নেই। কী নেই এই বাজেটে! রেলের ভাড়া, পণ্যমাশুল বাড়েনি, বেড়েছে ৫৬ এক্সপ্রেস, ৩ শতাব্দী, ৯ দুরন্ত, দুর্ঘটনা এড়াতে এবার বিশেষ উদ্যোগী রেলমন্ত্রী। ৮টি স্থানে সঙ্ঘর্ষ-নিরোধী যন্ত্র-- কারণ মমতা রেলমন্ত্রী হবার পর বেশ কয়েকটা বড় রেল দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তাঁর কর্তৃত্বের ওপর প্রশ্নচিহ্ন এঁকেছে অনেকে। তাঁর বিরুদ্ধে বামেদের অভিযোগ তিনি নাকি উন্নয়নবিরোধী, রেলে কর্মসংস্থান হয় না ইত্যাদি। সেদিকে খেয়াল রেখে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার পদ পূরণের ইচ্ছা, অভিন্ন নম্বরে সারাদেশে সুরক্ষার হেল্পলাইন। যে মমতার আন্দোলনের অভিমুখ ছিল বামেদের মতোই— ধর্না, অবরোধ, বনধের মতো অচল কর্মধারা তাতে এবারে লাগাম পরাতে চেয়েছেন মমতা দুটো অভিনব ঘোষণা করে। তা হলো— যে রাজ্যে আগামী এক বছরে রেল অবরোধ হবে না, সে রাজ্য দুটো নতুন গাড়ী, দুটো নয়া প্রকল্প পাবে। এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে কি তাঁর নিজের দলই? বাজেট ঘোষণার দিনই রেল অবরোধের নজির গড়ছে এরাজ্যে তাঁর দল। ৫৮ বছর বয়সের মহিলাদের ভাড়ায় ছাড়, অথচ পুরুষদের ক্ষেত্রে তা বাড়ল ৬২ বছরে-- এটা একরকম বৈষম্য-ই বলা যায়। ইন্টারনেটে টিকিট কেনার খরচ কমল, ৫৭,৬৩০ কোটি টাকার রেকর্ড পরিকল্পনা।

এবারের বাজেটে মমতার সাধ বেড়ে গেছে সাধ্যকে অতিক্রম করেই। কারণ রেল হলো দেশের সর্ববৃহৎ পরিকাঠামো সংস্থা। এতদিনে মমতা বেশ পক্কতা লাভ করেছেন রাজনীতিতে। কারণ সাধারণ মানুষ যেসব ব্যবস্থা নিলে হাত উপচে তাঁকে ভোট দেবেন তার পুরোদস্তুর ব্যবস্থা করেছেন এবারের বাজেটে। মানুষ সবচেয়ে খুশী হয় শহরতলীর ট্রেন সংখ্যা বাড়লে। নিত্যনৈমিত্তিক উপচে পড়া ভীড় থেকে মানুষ অফিস-কাছারি একটু আরামে যেতে চায়। সাধ্য কম তবুও মমতা দরজা হাতে হাওড়া, শিয়ালদহ দুই শাখাতেই অকৃপণ হাতে ট্রেন বাড়িয়ে দিয়েছেন। পূর্ব রেলে দুই শাখাতেই বারো বগির গাড়ি চালানোর বাসনা বহুদিনের রেল কর্তাদের। বগির অভাবে এখন পুরোপুরি তা সম্ভব হয়নি। তবুও যাত্রীদের দাবীকে অগ্রাহ্য করেননি মমতা।

সাধারণত পরিকাঠামোয় সরকার যে লগ্নী করে তা বাণিজ্যিক লগ্নী নয়। কারণ সরকার উন্নয়নের খাতিরে তা করে থাকে। এতে সরকারের ব্যয় হয়, কিন্তু আয় হয় না। তেমনই শহরে যে মেট্রো পরিকল্পনা রয়েছে তাতে এবারে লগ্নী ৬৫০২ কোটি টাকা। মেট্রোর পরিষেবা এবারে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিতে চান তিনি। মেট্রো পরিষেবাকে তিনি গঙ্গার দুই পাড়ে যথাক্রমে শ্রীরামপুর, কল্যাণী অবধি পৌঁছে দিতে চান। সেজন্য এই আর্থিক বছরে সমীক্ষা চালাবার কথা বলেছেন তিনি। এবারের বিধানসভা ভোটে তিনি যদি মুখ্যমন্ত্রী হন, তবে এই পরিকল্পনাগুলির কী হবে? এমন প্রশ্ন উঠছে সব মহলে। তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মমতা মুখ্যমন্ত্রী হলেও মমতা রেলমন্ত্রককে হাতছাড়া করবেন না। তাঁর অনুগত কেউ ওই পদে বসবেন আগামী ২০১৪ অবধি এবং তিনি যে মমতার নির্দেশ মতো রেল চালাবেন এটা একেবারে নিশ্চিত। মনমোহন-সনিয়া তাঁকে চটাবেন না, কারণ দুর্নীতির অভিযোগে দীর্ণ সরকার মমতার শরণ চাইছে। প্রদেশ সভাপতি তাঁর মমতা-বিদ্বেষ অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি রেল বাজেট নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মানস ভুঁইঞা।

মমতা কিন্তু আদৌ অকৃতজ্ঞ নন। কারণ গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল পা রেখেছিল মণিপুরে। সেখানে তিনি ডিজেল লোকোমোটিভ কারখানা গড়ার প্রস্তাব রেখেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চল যে জহর-ইন্দিরা- রাজীব জমানায় বঞ্চনার শিকার নয় তা প্রমাণ করতে গুয়াহাটিতে রেলের শিল্প-তালুক বাড়তে উদ্যোগী রেল। তিনি যে যথার্থ-ই রেল মিনিস্টার অব বেঙ্গল নন বরং রেল মিনিস্টার অব ইন্ডিয়া তা প্রমাণ করেছেন আরও একবার জম্মুতে একটি টানেল ও একটা ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা গড়বে রেল।

এতসব ঘোষণা, তাতে টাকা ঢালবার গৌরী সেন কে? এ প্রশ্ন সকলের। হবে তো সব ঠিকঠাক? এরই জবাবে মমতা বলেছেন যে, রেল আয়করমুক্ত সরকারী বণ্ড বাজারে ছেড়ে ১২০০০ কোটি টাকা তুলবেন। রেল ব্যবসা করে যে ১ টাকা তোলে তার মধ্যে ৪২ পয়সাই চলে যায় বেতন মেটাতে। যাত্রী

(এরপর ১৪ পাতায়)

সমস্যাই রাজনীতিকদের মূলধন

(৬ পাতার পর)

'বলি' ও প্রাদেশিকতার 'বলি' বাঙালিদের বাংলা ভাগের ভয় দেখিয়ে 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের জুজু দেখিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ করতে হবে। আমজনতার মধ্যে এই বোধ দৃঢ় করার উদ্যোগ নিতে হবে যে গোর্খা নয়, বাঙালি নয় সবার আগে আমরা একই ভারতমাতার সন্তান এই পরিচয়, এই অনুভূতিই ভারতের জনগণের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ হতে পারে। সেই সাথে রুখে দিতে পারে ভারতকে খণ্ড বিখণ্ড করে এদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধার 'বিদেশি' পরিকল্পনা। যে ভাবেই হোক নেপালী সেন্টিমেন্ট নিয়ে গুরুং ঘিসিংদের, আর দেশভাগের 'বলি' ও উগ্র প্রাদেশিকতার 'বলি' বাঙালি সেন্টিমেন্ট নিয়ে সিপিএম সহ বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক খেলা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে।

এরজন্য বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া এই সমস্যার কোনও সমাধান আছে বলে মনে হয় না। সবশেষে আর যে কথাটি বলার আছে তা হলো উত্তরবঙ্গে তো এখন সেন্টিমেন্টের ছড়াছড়ি। সেজন্য নির্বাচনের মুখে এখানকার মানুষকে বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে— না হলে কে যে কোনওদিন বিমলা রাই, ভিকি লামাদের (৮ ফেব্রুয়ারি শিবচুতে পুলিশের গুলিতে নিহত মোর্চা সমর্থক) মতো সেন্টিমেন্টের বলি হয়ে যাবে কে জানে।

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

(১২ পাতার পর)

পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া যায়।

উপার্জন

হস্‌পিটাল ম্যানেজার হিসেবে প্রথম দিকে মাসে ৮ কিংবা ১২ হাজার টাকা থেকে শুরু করে অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকার পরিমাণ ৪০ হাজারও হতে পারে। একজন হস্‌পিটাল ম্যানেজমেন্ট লেকচারার মাসে অনায়াসে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন।

কী কী কোর্স

ব্যাচেলর অব হস্‌পিটাল ম্যানেজমেন্ট। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট, মাস্টার অব্ হস্‌পিটাল ম্যানেজমেন্ট। অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, এম বি এ ইন হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এম ফিল ইন হস্‌পিটাল অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন ইত্যাদি।

কোথায় কোথায় পড়ানো হয়

(১) পৈলান গ্রুপ কলেজ অব হস্‌পিটাল ম্যানেজমেন্ট, বেঙ্গল পৈলান পার্ক, ফেজ-৩, আমগাছিয়া রোড, কলকাতা-১০৪। মোবাইল ঃ ৯৮৩০২৭২২৫৩।

(২) জেনেক্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড্ আই টি কলেজ, এফ ই-৩৬৯, সল্টলেক, বিধাননগর, কল-১০৬, মোবাইল ঃ ৯৮৩১১১৫৩৪৩।

(৩) এন এস এইচ্ এম নলেজ ক্যাম্পাস, ৬০ (১২৪) বি এল সাহা রোড, নিউ আলিপুর, কল-৫৩, মোবাইল ঃ ৯৭৪৮৪২১৩৬০।

সমাবেশ সমাচার

কল্যাণ আশ্রমের যুবশাখার 'জাগৃতি-২০১১'

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা ও হাওড়া মহানগর শাখার উদ্যোগে গত ৬ মার্চ মহাজাতি সদন-এর অ্যানেক্স হলে

দীপিকা ও ময়ূখ

অনুষ্ঠিত হলো— 'জাগৃতি-২০১১'। এক বিনোদন, শিক্ষা ও জাগরণমূলক প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক গ্রুপ বা দলকে মাথা খাটিয়ে বের করতে হয়েছে একটি বিশেষ বিষয়। তারপর অনুশীলন এবং দর্শক শ্রোতাদের সামনে তার উপস্থাপন। তারও পর আছে। দর্শকদের জিজ্ঞাসার সমাধান।

একটি বহুচর্চিত বিষয় উপস্থাপন করলেন দীপিকা ও ময়ুখ শাহ। ইণ্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ বা আই পি এল ক্রিকেট সীমিত (২০) ওভারের প্রতিযোগিতা। তাঁরা একটু অদলবদল করে নাম দিয়েছেন— ইন্ডিয়ান পয়সা লীগ। ক্রিকেটের বিরোধিতা নয়, ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা এবং সেন্টিমেন্টকে ভাঙিয়ে যে ব্যবসা ও আর্থিক দুর্নীতি চলছে সেটাই সোজাসুজি দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের দ্বারা উপস্থাপন। এক কথায় সমসাময়িক বিষয়।

এরকমই আর একটি উপস্থাপনা, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নাটকের মাধ্যমে যোগ-প্রাণায়াম ও আয়ুর্বেদকে অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির কার্যকারিতাকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা।

এভাবেই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা, জাগরণ ও বিনোদনের এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। পাওয়ার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কল্যাণ আশ্রমের যুবশাখার তরুণ-তরুণীরা কল্যাণ আশ্রমের সেবাকাজকে তুলে ধরলেন। এখনও অনেক পথ বাকী। এগিয়ে যেতে হবে, চরৈবেতি।

শ্রী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের জন্মদিবস উদ্‌যাপন

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রয়াত শ্রী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের ১০৫তম শুভ জন্মদিন পালিত হলো তাঁরই প্রতিষ্ঠিত দ্বারহাট্টা উচ্চ বিদ্যালয়ে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের

শুভ সূচনা করেন মহারাজের সহকর্মী শ্রী জ্যোতির্ময় সরস্বতী ও শিশু মন্দিরের সভাপতি বিমল কান্তি পাল। দ্বারহাট্টার শিশু মন্দিরের ভাইবোনেরা প্রভাতফেরীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নরেশ দারুকা মহাশয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বৃন্দাবন ঘোষ, পশুপতি ঘোষ, হুগলি বিভাগ প্রচারক প্রফুল্ল ঘোষ ও জেলা প্রচারক গোপাল ঠাকুর। এই অনুষ্ঠানে ৮ জন মহিলা সমেত মোট ৪৮ জন রক্তদান করেন। ৪০ জনের চক্ষু ও ৫০ জনের ব্লাড সুগার পরীক্ষা হয়। নিউরোথেরাপি করানো হয় ১০ জনের। অনুষ্ঠানের শেষে শ্রী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশু মন্দিরের সম্পাদক তপন ভড় স্কুলের জন্য সাহায্যের আবেদন জানান সকলের কাছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বারহাট্টা নিবাসী শ্রী পঞ্চানন কুঁকড়ী মহাশয় বকুলের জন্য ৮ শতক জমি দান করেছেন। আশপাশের অধিকাংশ গ্রামের প্রতিনিধিত্ব হয় এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অদ্বৈতনাথ দে।

দিনহাটায় সমবেত উপনয়ন

সংবাদদাতা।। উত্তরবঙ্গ পুরোহিত মঞ্চের পরিচালনায় এবং প্রকাশ চক্রবর্তী মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গত ১৪ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার জেলার দিনহাটায় গোপাল নগর-এ গোপাল মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো সম্মিলিত (গণ-উপনয়ন) উপনয়ন অনুষ্ঠান। ওই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে দীঘি থেকে জল নিয়ে আসে। শোভাযাত্রার মূল আকর্ষণ— দুইটি ভ্যানে দুইজন ব্রাহ্মণ গৈরিক বসন পরিধান করে কমুন্ডল ও ব্রহ্মচারীর বেশে দণ্ড হস্তে উপবিষ্ট। মায়েদের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে সেদিন দিনহাটা শহরের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছিল।

উপনয়ন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে মহাদেব গোস্বামীর বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ৪২ জন ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন সম্পন্ন হয়।

শোকসংবাদ

দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় প্রভাত শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ডাঃ সুভাষচন্দ্র আচার্যের মাতৃদেবী শ্রীমতি সুষমা আচার্য গত ৩ মার্চ নিজ বাসভবনে স্বর্গগত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বৎসর।

মৃত্যুকালে দুইপুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের রেখে গেছেন।

নেতাজীকে নিয়ে ধারাবাহিক শ্যাম বেনেগালের

মিতদ্রু দত্ত

'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো'— এই মহান উক্তি যাঁর তিনি আমাদের প্রিয় নেতাজী। তাঁর মৃত্যু রহস্য আজও অজানা। চলচিত্রের পর এবার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু-কে নিয়ে একটি ধারবাহিক নির্মাণের কাজে হাত দিলেন পরিচালক শ্যাম বেনেগাল। নির্মীয়মান ধারাবাহিকটির নাম রাখা হচ্ছে 'নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস।' শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় বড় পর্দায় 'বোস দ্য ফরগটন হিরো' ছবিতে পূর্ণবয়স্ক নেতাজীর কথা থাকলেও সেভাবে ছিল না তাঁর ছোটবেলার কথা। কিশোর সুভাষের নানা অজানা কাহিনীও তুলে ধরা হচ্ছে এখানে। বাল্যকাল, কৈশোর, স্কুল ও কলেজ জীবনের নানা ঘটনা ও তথ্য তুলে ধরা হয়েছে পরম যত্নে। তাঁর কথাবার্তায় যে সারল্য প্রকাশ পেত, যে দৃঢ়চেতা মনোভাব ছিল, তা বর্তমান প্রজন্মের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতেই মূলত এ কাজে হাত দিলেন পরিচালক শ্যাম বেনেগাল। তিনি এক একান্ত আলাপচারিতায় জানালেন, দেশ আজ বড়ই সংকটময় মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নগ্ন, হিংস্র

আক্রমণ আমাদের ভারতীয় সনাতন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে তৎপর। বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং নানা সামাজিক সমস্যারও প্রতিদিন মুখোমুখি হচ্ছেন প্রত্যেক ভারতবাসী। এই সময়ে দাঁড়িয়ে নেতাজীর সমাজভাবনা, রাজনৈতিক দর্শন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রয়োজন তিনি বড় বেশি করে অনুভব করছেন বলে জানালেন পরিচালক। তাই একাজে হাত দিয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছে। শরীরও ভাল থাকে না। তবে কাজটা শুরু যখন করেছেন শেষ অবশ্যই করবেন, এমনই দৃঢ়তা তাঁর কণ্ঠে। এটি তাঁর স্বপ্নের নির্মাণ বলা চলে। জানালেন, "ছবিটা করে আমি একরকম ভাবে তৃপ্ত আর এ ধারাবাহিকের তৃপ্তিটা অনেকটাই আলাদা। প্রশংসা, পুরস্কার, খ্যাতি সব কিছুই পেয়েছি। ঈশ্বরের আশীর্বাদে অর্থ উপার্জনেও করেছি প্রচুর।

আমার মনে হয়েছে, ভবিষ্যত প্রজন্ম আজ বড় দিশাহীন। স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষ, ভগৎ সিং-দের আদর্শ এরা সঠিকভাবে জানে না। তাই তাদের কাছে পৌঁছতেই এই ধারবাহিক।" অসাধারণ মেধাবী এক ছাত্রের বড় হয়ে ওঠার নানা দৃশ্য ধরা থাকছে এই ধারাবাহিকে। কিশোর সুভাষের ভূমিকায় অভিনয় করছেন স্নেহাশিস রায়। বড় সুভাষ শচীন খেড়কর ('বোস'খ্যাত) । সুভাষচন্দ্রের কলেজ জীবনের নানা দিকও বিভিন্ন পর্বে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। প্রথম দিকে তাঁর সমাজবোধ ও দায়বদ্ধতা, মাঝে ইংরেজ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হওয়া। প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন সাহেবের সঙ্গে বচসার জেরে বহিষ্কার এবং তার পরবর্তী কিছু অধ্যায়ও এখানে সুনিপুণভাবে সংকলিত হয়েছে। নেতাজী সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিকের মতামত, বইপত্র ও জীবনী পড়ে বর্তমান যুগে নেতাজীর প্রাসঙ্গিকতা মাথায় রেখেই এই ধারাবাহিক থাকছে দেশনায়কের জীবনের নানা অজানা কাহিনীও। ঝাঁসি বাহিনী, আই. এন. এ. গঠন সহ ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার কথাও থাকছে। তাঁর ব্যক্তিগত নানা মুহূর্তও দৃশ্যায়িত হয়েছে এই সিরিয়ালে। প্রায় হাজার পর্বের এই মেগার বক্তব্যও ছবির থেকে অনেকটাই বেশি। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনেক পড়াশোনা, অনেক গবেষণার পরই কাজে হাত দিয়েছেন শ্যাম বেনেগাল। শিল্প নির্দেশনা সমীর চন্দ্রের। কলকাতা পর্বের শ্যুটিং পরিচালক সুবীর চন্দ্র। সঙ্গীত এ. আর. রহমানের। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী দেড় মাসের মধ্যেই এটি দেখা যাবে সাহারা ওয়ান চ্যানেলে। দেশবাসীর প্রতি বেনেগালের এটিই শ্রেষ্ঠ উপহার বলে জানালেন স্বয়ং পরিচালক। নেতাজী চরিত্রে রূপদানকারী শচীন খেড়কর জানালেন। এ চরিত্রে যতবারই অভিনয় করা হোক না কেন প্রতিবারই চিরনতুন এক অনুভূতি, এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

শব্দরূপ-৫৭৪

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

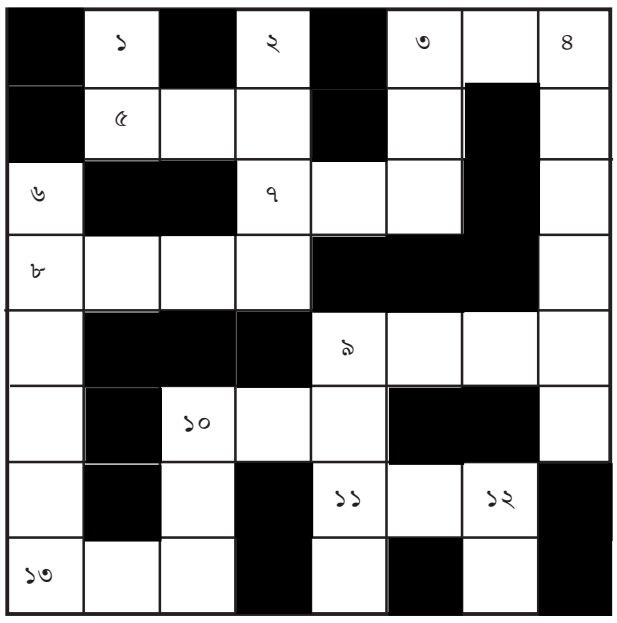

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ৩. রামায়ণোক্ত নদী বিশেষ, এর নিকটস্থ বনাশ্রমে মহামুনি বাল্মীকির রসনা হতে ছন্দোবদ্ধ প্রথম শ্লোকের উৎপত্তি হইয়াছিল, **৫.** মহোৎসব (বৈষ্ণবের), **৭.** হালুয়া, **৮.** গীতায় উক্ত জ্ঞানমূলক সাধনাপদ্ধতি, **৯.** বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক, **১০.** "গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা/দুই চোখে দুই জলের ধারা—, যমুনা" **১১.** পবননন্দন, হনুমান, **১৩.** রাম কর্তৃক নিহত রাক্ষসী, মারীচের জননী।

উপর-নীচ ঃ ১. আকাশ, **২.** নগদ/মোট, থোক, **৩.** শিশুর আক্ষেপ রোগ, **৪.** মূর্তিপূজা, **৬.** জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা; বৌদ্ধমতে দেবীরূপে কল্পিত, **৯.** "—ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ" **১০.** অপ্সরাবিশেষ; শকুন্তলার জননী, **১২.** চন্দ্রমাসের একদিন।

● ৫৭৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৮ মার্চ, ২০১১ সংখ্যায়

শুভ চেতনা ও মূল্যবোধের নাটক 'আমরা'

মিতদ্রু দত্ত।। আমরা যারা সাধারণ। আমরা যারা আপাতদৃষ্টিতে ভীতুও তারা কোনও কাজই ঠিকমতো করতে পারি না। কী বাড়িতে, কী বাইরে। আর তাদের নিয়েই নাট্যম-এর নতুন প্রযোজনা 'আমরা।' নির্দেশনা বিমল দেব। কাহিনী অনেকটাই আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সাথে মিলে

যায়। ৩৪ বছরের বামশাসনে শ্মশান হয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গ। কর্মহীন লক্ষ লক্ষ যুবক। কলকারখানা বন্ধ। আত্মহত্যা, মৃত্যু, ধর্ষণ, শোষণ-সন্ত্রাস চারদিকে। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। কেউ সাহস করে প্রতিবাদে সামিল হতে পারেন না। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবন তাই শাসকের দয়ায় চলছিল ভালই, হঠাৎই তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠল। না, আর নয় এ সন্ত্রাসরাজ। এল সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড়, রাজারহাট কাণ্ড, দুর্নীতি আর স্বজনপোষণের কাহিনী ছড়াল দাবানলের মতো। গান, কবিতা লেখা হলো প্রতিবাদে ভর দিয়ে। এমনই সময়ে একদল হিজড়াও প্রতিবাদী হয়ে কী করল তারই কাহিনী 'আমরা'। আসলে যারা সমাজে থেকেও শাসকের ক্রীতদাস, তাদের যৌন প্রতিবন্ধীদের সাথে তুলনা করা হয়েছে নাটকে। আলো ও মঞ্চায়োজন চমৎকার। প্রশংসনীয় অভিনয়ে উল্লেখ্য রাজা দেব, কৌশানী রায়, বিমল দাস, রুণু মেহতা, নাদিম বক্সী প্রমুখ। নাটিকাটির সঙ্গীতে আছেন চন্দন রায়চৌধুরী। মঞ্চ ও আলোকপরিকল্পনা বিলু দত্তর। বারবার দেখার মতোই নাটক। মানবিক চেতনা ও মূল্যবোধের পক্ষে এ নাটক এক বড় হাতিয়ার। মানুষের কথা বলার অধিকার যখন কেড়ে নেওয়া হয়। যখন সব ভালোকে আড়াল করে রাত্রির কালো তখনই তো সমাজটা যৌন প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। প্রতিবাদ করতে ভুলে যায়। খালি আপোষ করতে চায়। স্বার্থপর হয়ে একা একা বাঁচতে চায়। এ নাটকে সে কথাই তুলে ধরা হয়েছে বার বার। নানা দৃশ্যে। এমন চমৎকার নাটক দীর্ঘদিন বাদে মঞ্চে এল। নাট্যম্ প্রযোজনাটিও সামগ্রিক ভাবে প্রশংসনীয় ও সার্থক।

রেল বাজেট — ২০১১

(১৩ পাতার পর)

পরিবহনে যেটা সবচেয়ে জরুরী তা হলো রক্ষণাবেক্ষণ, আর এখানেই রেল খরচ করে মাত্র ২ পয়সা। জ্বালানি খরচ রেলের ১৬ পয়সা। আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়ায় যেভাবে গণ্ডগোল ছড়াচ্ছে তাতে জ্বালানি ব্যয় ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। রেল যে ১ টাকা আয় করে তার ৬৫ ভাগ আসে পণ্য পরিবহণ, ২৬ প. আসে যাত্রীপরিবহণ এবং অন্যান্য ৯ প. আসে বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য সূত্র থেকে।

ঘুরে ফিরে আসে সেই একই কথা। বাংলার প্রতি এত বদান্যতা দেখাবার মমতার অভিমুখ কিন্তু সেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। দক্ষিণবঙ্গে যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও উত্তরবঙ্গে তুলনামূলকভাবে শক্তি কম মমতার। সেখানে কংগ্রেসের অধীর-দীপার মতো নেতাদের ওপর নির্ভরশীলতা বেশি। তাই শিয়ালদা থেকে প্রণবদার নির্বাচনী কেন্দ্র জঙ্গিপুর পর্যন্ত রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছেন মমতা। দার্জিলিং জ্বলছে। তাই দার্জিলিং-এর ক্ষোভের প্রলেপ দিতে সফ্‌ট্‌ওয়ার শিল্প গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে রেল। সৈন্যবাহিনীতে গোর্খাদের জনপ্রিয়তা খুব। তাই এদের সাহসিকতা ও নিষ্ঠাকে স্মরণীয় করে তুলতে প্রাক্তন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের জন্য আর পি এফের আসন খালি রেখেছেন মমতা।

লক্ষ্য যাইহোক, বহুদিন বঞ্চনার শিকার বাংলাকে উন্নয়নের তবকে মুড়ে ফেলতে মমতার প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। 'যদিটদি' বাদ দিয়ে মমতার Budgert Proposal সত্যিই Disposal-এ পর্যবসিত হয় তবে বঙ্গবাসীর আশীর্বাদ শুভকামনা চিরদিন থাকবে মমতার পাশে। গত ৩৫ বছর ধরে যে বন্ধ্যা রাজনীতির শিকার এই বাংলা তাতে দিগন্তে আলোর একটু ঝলকানি দেখতে পাচ্ছে বঙ্গবাসী। সাধু মমতা, সাধু!

ভ্রান্ত রাজনৈতিক দিশা ও মতাদর্শহীনতাই দুর্বল করছে তৃণমূলকে

অমলেশ মিশ্র

২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর এমন একটা হাওয়া বইল যে, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম তথা বামফ্রন্টকে উঠে ঘাস খেতে হবে না। 'পরমন্তি শয়নে সমুসদর্পরিত' হয়ে যাবে। ৪২টি লোকসভা আসনের ২৯৪টি বিধানসভাতেই বামপন্থী বিরোধী জোট খুব ভাল ফল করেছে এবং প্রায় ২৪৩-২৫০ টি ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ। নাম দেওয়া হলো 'পরিবর্তনের হাওয়া।' মাস ছয়েক পরে মাত্র দু'জন বামনেতা— অশোক ভট্টাচার্য ও সুশান্ত ঘোষ প্রকাশ্যে সাহস দেখিয়ে বললেন যে বামফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় আসবে।

তৃণমূল কংগ্রেস নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগল বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আনতে —পরিবর্তনের হাওয়া প্রবল থাকতে থাকতেই বিধানসভা জয় করতে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে হৈ-চৈ কম হলো না, এখনও চলছে। তৃণমূল চাইল কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে যেমন জোট না করেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া গেছে বিধানসভায় তাই-ই ঘটুক। আর জোট যদি করতেই হয়, তবে আসন ভাগাভাগি এমন ভাবে করতে হবে যাতে ১৪৮ আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় হয়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অভিমুখ পরিবর্তনে তৃণমূল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। একজন ব্যতীত দু'জন নাই এবং যে একজন আছেন তিনি রাজনৈতিক অভিমুখ রচনার ক্ষমতা ধরেন না। ফলে প্রায় পরাজিত সিপিএম ধীরে ধীরে জমি ফিরে পেতে লাগল। এমন ভাবে লাগল যে সেই পরিবর্তনের হাওয়াটা দুর্বল হয়ে গেছে— অষ্টম বামফ্রন্ট এখন আর কথার কথা বলে মনে হচ্ছে না।

একটি ভুল স্লোগান, একটা গোঁয়ার্তুমি প্রায় ক্ষমতায় পৌঁছে যাওয়া একটি দলকে কীভাবে পিছিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গেই তার একমাত্র উদাহরণ।

২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল তার রাজনৈতিক অভিমুখ করল সিপিএম-এর নকল করে— এলাকা দখলের রাজনীতি, অন্য কোনও দল এলাকায় থাকবে না, থাকবে শুধু তৃণমূল। বলা বাহুল্য, এটা ১০-২০-৫০ টা আসনে চলতে পারে— ২৯৪-টাতেই চলতে পারে না। কেন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন। একবিংশ শতাব্দীতে এখন আর সংবিধানের ওই ধারা প্রয়োগ সম্ভব নয়, বিশেষ করে সুপ্রীম কোর্টের ওই রায়ের পর। এর সঙ্গে যুক্ত হলো শুচিবাই। সিপিএম বা বামেরা যেখানে থাকবে সেখানে যাব না। রেলমন্ত্রককে কাজে লাগিয়ে যা করার একাই করব দলের নামে। সমস্ত সংবাদমাধ্যমকে কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে— তাদের সমালোচনার শক্তি ঠুঁটো করে দেওয়া। আমার তো মনে হয় এরাজ্যের কিছু সংবাদমাধ্যম তৃণমূলের মুখপাত্র হয়ে তৃণমূলের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং করছে। তারা তৃণমূলের স্ববিরোধিতাগুলি যেমন তুলে ধরেন না, তেমনি অযৌক্তিকভাবে সরকারকে গালি পাড়েন।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো— যে দল ক্ষমতায় আসতে চায়, রাজ্য শাসন করতে চায়, সেই দলের কোনও নেতাই রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে পারেন না— বিধানসভা বা তার বাইরে গালিপাড়া ছাড়া রাজনৈতিক ভাষণ বা বিশ্লেষণে তাদের কোনও উদাহরণই নাই। সিপিএম সন্ত্রাস করছে, আমাদের খুন করছে, হার্মাদ বাহিনী পুষছে, ওদের হাতে রক্তের দাগ, ওদের সঙ্গে কোনও বৈঠক করব না, আমরা ক্ষমতায় এলে দেখিয়ে দেব ইত্যাদি কোনও রাজনৈতিক দলের মুখ্য ভাষণ হতে পারে না।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো— যে দল ক্ষমতায় আসতে চায়, রাজ্য শাসন করতে চায়, সেই দলের কোনও নেতাই রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে পারেন না— বিধানসভা বা তার বাইরে গালিপাড়া ছাড়া রাজনৈতিক ভাষণ বা বিশ্লেষণে তাদের কোনও উদাহরণই নাই। সিপিএম সন্ত্রাস করছে, আমাদের খুন করছে, হার্মাদ বাহিনী পুষছে, ওদের হাতে রক্তের দাগ, ওদের সঙ্গে কোনও বৈঠক করব না, আমরা ক্ষমতায় এলে দেখিয়ে দেব ইত্যাদি কোনও রাজনৈতিক দলের মুখ্য ভাষণ হতে পারে না। সিপিএম বিরোধী কোনও পাল্টা দিশা পাওয়া গেল না। ভাষার কোনও বাঁধন নাই। যে কোনও স্তরের নেতাই মুখ্যমন্ত্রীর কোমরে দড়ি বেঁধে ঘুরাবেন, এই পুলিশ অফিসারকে দেখে নেবেন বা ওই আমলাকে ছেড়ে কথা বলবেন না ইত্যাদি হাজারো হুমকি।

এতে প্রতিশোধপরায়ণতা ধরা পড়ে— গঠনমূলক চরিত্র দেখা যায় না। যে সব পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদে ক্ষমতায় এলো, সেখান থেকে অপটুতা, অদক্ষতা এবং দুর্নীতির খবর আসতে লাগল। রাজনৈতিক মতাদর্শবিহীন কিছু মানুষ একত্র হলেই রাজনৈতিক দল হয়ে যায় না। পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ এখনকী রেলমন্ত্রককেও প্রচুর উদ্যোগ ও শিলান্যাস-এর সংবাদ পাওয়া গেল এবং দেখা গেল রেলমন্ত্রক শুধু সেউলিয়া হওয়ার অপেক্ষায়। রাজ্য থেকে নির্বাচিত রেলমন্ত্রী রাজ্য সরকারের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখেন না। কেন্দ্রীয় সরকারও ঠিক ঠিক অবগত নয় যে ওই মন্ত্রকে কী হচ্ছে আর কী হচ্ছে না।

জন সাতেক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কেবল নিজের নিজের এলাকায় দলীয় রাজনীতি করে বেড়াচ্ছেন অপরিকল্পিতভাবে। তাদের দপ্তরের মাধ্যমেও এই রাজ্যের জন্য কিছু করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তারা তাও করছেন না।

এখন সংশয়হীন ভাবে জানা গেছে যে মাওবাদী এবং তাদের প্রকাশ্য সংগঠন জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সেই নন্দীগ্রাম- সিঙ্গুর আন্দোলন থেকেই। এলাকা দখলের রাজনীতিতে তারাই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান শক্তি। কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্ব অনুসারে মাওবাদীশক্তি দেশের প্রধান আভ্যন্তরীণ বিপদ। যৌথবাহিনীর কাজ হবে মাওবাদী শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করা। দেশের একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল এবং এই কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের এই অবস্থানের বাইরে যেতে পারে না। অথচ তৃণমূল তাই-ই করেছে। মাওবাদী শক্তির প্রতি শুধু দুর্বলতা প্রদর্শন নয়, সখ্যতা সিপিএম এবং বামফ্রন্টকে সংযোগ করে দিয়েছে।

সিপিএম-এর কথাবার্তা এখন অনেক সংযত এবং সরকারী কোষাগার-এর অবস্থা নির্ভরযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও বেশ কতকগুলি জনমুখী প্রকল্পের বাস্তবায়ন— তাকে ক্ষমতায় ফিরে আসার প্রত্যাশা যোগাচ্ছে।

ভুল রাজনৈতিক দিশা, মতাদর্শহীন রাজনৈতিক কর্মী, রাজনৈতিক ছুঁৎমার্গ, অরাজনৈতিক ভাষণ (এমনকী বিধানসভা বয়কট), প্রশাসনিক অদক্ষতা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তৃণমূল কংগ্রেসকে আগামী তিন মাসে আরও দুর্বল করবে। ফলে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন এ রাজ্যে বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক মনে হ'চ্ছিল তা কঠিন ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। প্রতি বুথে বামবিরোধী জোটের ১০টি ভোট কমাতে পারলেই বামেরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবে। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেস যে মনোভাব (উন্মাসিকতা) নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রাত্যহিক ব্যবহার করছেন তাতে ওই ১০টি ভোট কমানো সহজতর হচ্ছে।

গেরুয়া মওলানারা এখন আর এস এসের ভাবধারা প্রচারে

মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আর এস এসের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য ইন্দ্রেশকুমার (ফাইল চিত্র)।

লখনৌ ঃ মহম্মদ ওয়াহিদ চিস্তি যা করছেন তা অনেকেই সাহস করতে পারবেন না। ১৫ জনের 'গেরুয়া মওলানা' দলের সদস্য হিসেবে মহম্মদ চিস্তি লখনউ শহরের মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন গলি পরিক্রমা করছেন। উদ্দেশ্য, মুসলমানদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আর এস এস) ভাবধারা প্রচার করা। মঙ্গলবার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে লখনউ শহরে মঙ্গালি মহল, মডেল টাউন এবং বাইসি মসজিদ এলাকায় চিস্তিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সঙ্ঘের প্রকাশিত এক পুস্তকও বিলি করছেন তিনি। ২৪ পৃষ্ঠার ওই বইয়ে গেরুয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংঘের যুক্তি-তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। রাম জন্মভূমি আন্দোলন সম্পর্কে সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গিও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চিস্তির আবেদন, 'আপনারা এই বই পড়ুন, এটাই আমার অনুরোধ। পড়ে আমাকে জানাবেন, এর সঙ্গে আপনারা একমত কিনা!' প্রসঙ্গত জামে মসজিদের ইমাম মওলানা আব্দুল বুখারির সমালোচনায় পড়েছিলেন চিস্তি কিছুদিন আগে। লখনউতে চিস্তি যখন এক সাংবাদিক সম্মেলনে আরজেবি-কমপ্লেক্সকে অযোধ্যার পূর্বতন রাজার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তখন বুখারি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। আর এস এস-এর চলতি গৃহ সম্পর্ক অভিযানের অঙ্গ হিসেবে চিস্তি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মুসলিম মহলায় সঙ্ঘের ভাবধারা প্রচার নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মহম্মদ আলমের মতো অনেকে এতে বিস্মিত। মিরাজ হোসেন নিজের রাগ সামাল দিতে দাঁত কিড়মিড় করছেন। তবে প্রবীণ আবিদি সরাসরি এতে সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন। শিয়া স্নাতকোত্তর কলেজের ছাত্র প্রবীণ আবিদির প্রতিবেশী আরশাদ হোসেন অবশ্য বলেছেন, বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা সবসময়ই স্বাগতযোগ্য। এর নির্যাস যাই হোক না কেন, আলোচনার প্রয়োজন। আলম সন্দেহের আবর্তে থাকলেও স্বীকার করেছেন, এই প্রথম গত ৬০ বছরে মঙ্গালি মহলের গলির সামনে থেকে একজন খাঁকিওয়ালাকে দেখছেন। যদিও খাঁকি এবং ফেজ একসঙ্গে চলতে পারে না। মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের লখনউ বিভাগ সংগঠক, মহম্মদ আফজল সহ বেশ কয়েকজন এই অভিযানে রয়েছেন। এর সঙ্গে জড়িত ডঃ উমেশ কুমার বলেছেন, বেশিরভাগ মুসলিম ভাই এতে উৎসাহিত হয়েছেন। প্রচার অভিযানে যেসব বক্রোক্তির মোকাবিলা করতে হয়েছে সেসবকে ধর্তব্যের মধ্যে আনছেন না উমেশ কুমার। প্রথম এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ায় অনেক মুসলমান খানিকটা সতর্ক। উমেশ কুমাররা তাদের ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিয়েছেন সঙ্ঘের আদর্শ। মহম্মদ আরিফ বিষয়টিকে কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। তিনি প্রকাশ্যে চিস্তিদের গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তা সত্ত্বেও কুমার দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন।

কুমার দাবি করেন, গত দু'দিনে আমরা ২৬ হাজার সঙ্ঘ প্রকাশিত পুস্তিকা বিতরণ করেছি। অনেকেই যেচে পাঁচ টাকা দিয়েছেন। তিনি উৎসাহের সঙ্গে বলেন, এক গলি থেকেই দেড়শ' টাকা পেয়েছি। এটাকে কি ইতিবাচক সাড়া বলব না। কেউ কি কখনও তা ভাবতে পেরেছে। ওই পুস্তিকায় রাহুল গান্ধী এবং দিগ্বিজয় সিং সম্পর্কেও মন্তব্য রয়েছে। রাহুল গান্ধীর যে বিতর্কিত মন্তব্য উইকিলিক্স ফাঁস করেছে, সে সম্পর্কে সঙ্ঘ পুস্তিকায় বলা হয়েছে, একই পাল্লায় যখন রাহুল গান্ধী সঙ্ঘ এবং সিমিকে ওজন করতে চান তখন সবার হাসি ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প থাকে না। রাহুল কংগ্রেস বা তাঁর পূর্বপুরুষদের ইতিহাস ভাল করে জানেন না। দিগ্বিজয় সিং সম্পর্কে বলা হয়েছে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য একজন রাজনীতিবিদ কতটা নিচে নামতে পারেন এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন দিগ্বিজয় সিং।

—দৈনিক যুগশঙ্খ-এর সৌজন্যে।

Swastika
14 March - 2011, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

বইয়ের উদ্বোধনে ননী গাঙ্গুলী, মনোজ রায় ভৌমিক ও দীনেশ চন্দ্র সিংহ।

নোয়াখালী সম্মিলনী'র মিলনোৎসব

সোনার নোয়াখালি ভুলি নাই তব নাম

বাসুদেব পাল

"দূর থেকে জানাই প্রণাম
দূর থেকে জানাই প্রণাম
সোনার নোয়াখালী
ভুলি নাই তব নাম।"

এভাবেই নোয়াখালী'র বন্দনা করেছেন সুসন্তান ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ। বাংলাদেশে) সুসন্তান। এঁরা সকলে নোয়াখালী ছেড়ে আসতে বাধ্য হলেও নোয়াখালীকে ভুলতে পারেননি। সেজন্য তাঁরা ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নোয়াখালী সম্মিলনী'র প্রদীপকে শতেক ঝড়ঝাপ্টা-বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও জ্বালিয়ে রেখেছেন এক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছেন। ফলে সবারই তিনটি 'মা'— জন্মদাত্রী মা, মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা।" শ্রী চক্রবর্তী এজন্য উপস্থিত সকলকে অন্তরের আবেগ অনুভূতিসহ সদা সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।

প্রায় দু'শজনের উপস্থিতিতে এক বিরল দৃশ্য। লেখক, প্রকাশক অর্থাৎ 'নোয়াখালী সম্মিলনী'র সম্পাদক,

(বাঁ দিক থেকে) বইয়ের প্রচ্ছদ।। বক্তব্য রাখছেন চারণ চক্রবর্তী।। বইয়ের ভিতরের একটি পৃষ্ঠা।

তাঁর লেখা 'নোয়াখালীর মাটি ও মানুষ' বইয়ে। সেই বই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে। পাঠকদের দাবী মেনে বর্ধিত কলেবরে এবার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো গত ৬ মার্চ দুপুরে, কলকাতার ভারতসভা হলে। বইটির আবরণ উন্মোচন করলেন কলকাতায় ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নোয়াখালী সম্মিলনী'র কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি ননী গাঙ্গুলী। মঞ্চে ছিলেন লেখক নিজে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ রায়ভৌমিক, অমিয়কান্তি রায় এবং আরও অনেকেই। সবাই নোয়াখালীর (বর্তমানে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এন আর এন (নন রেসিডেন্ট নোয়াখালীয়ারা)-রা একটি বৃহৎ পরিবারে পরিণত হয়েছেন এপারে পশ্চিমবঙ্গে। বাৎসরিক সম্মেলনে অনেকেই সপরিবারে প্রতিবার যোগ দেন। এবারও দিয়েছিলেন।

তবে ভরা দুপুরে এসে সম্মিলনীর সম্মেলনের মূল সুরটা বেঁধে দিলেন নোয়াখালীর আরেক সুসন্তান পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান চারণ চক্রবর্তী মশায়। তিনি তাঁর স্বল্প বক্তব্যেই সম্মেলনের সুরটা বেঁধে দিলেন এই বলে—"শিকড়কে ভুলে যাওয়া যায় না। সভাপতি সকলেই দাম দিয়ে এই অমূল্য দলিলরূপী বইটি কিনে নিচ্ছেন। লেখক ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁর স্বল্প ভাষণে প্রথমেই নোয়াখালী সম্মিলনী'র এবং অন্য তিনজন সদস্যের (উষারঞ্জন মিত্র, লোকনাথ ভৌমিক ও অজিতরঞ্জন চৌধুরী) প্রতি বইটি প্রকাশে আর্থিক সহযোগিতার জন্য সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। ঘোষণা করে দিলেন— বিক্রীর তাবৎ অর্থ 'নোয়াখালী সম্মিলনী'র প্রকাশন তহবিলে জমা হবে। তাঁর আশা, টাকার অঙ্কটা প্রায় এক লক্ষ হবে। জমা অর্থ থেকে প্রাপ্ত সুদে আরও প্রকাশনের কাজ হবে। তবেই তিনি তাঁর পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবেন।

এদিন মঞ্চস্থ সকলকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন উদ্যোক্তরা। কান পেতে শোনা গেল অনেকেই মাঝে-মধ্যে বাংলাদেশে যান। মাটির টান যায়নি। এটাই আশার কথা। গান, নাচ, আবৃত্তি, যোগাসন, ম্যাজিক, নাটিক— সব মিলিয়ে জমজমাট মিলনোৎসব। বইটির এবারকার বর্ধিত সংস্করণে স্থান পেয়েছে— নোয়াখালীর দাঙ্গার (১০ অক্টোবর-১৯৪৬) বিস্তারিত বিবরণ। যা এক প্রামাণ্য দলিল। নোয়াখালীর ইতিহাস সবারই জানা দরকার। সেক্ষেত্রে এই বইটির সমতুল আর নেই। এই বইয়ের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডেপুটি রেজিস্টার দীনেশবাবু সম্মানিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার-এ। তাঁর আরও একটি ইংরেজীতে লিখিত গবেষণামূলক পুস্তক— '১৯৪৬ : দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস অ্যান্ড নোয়াখালী জেনোসাইড' তৈরি হয়ে গেছে। দিনক্ষণ স্থির হলেই প্রকাশিত হবে। 'নোয়াখালীর মাটি ও মানুষ' তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদ্বয় নলিনীরঞ্জন মিত্র এবং নিবারণচন্দ্র দে মহাশয় এবং পরলোকগত দুই মামার স্মৃতিতে।

'নোয়াখালীর মাটি ও মানুষ'
লেখক ঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ
প্রকাশক-নোয়াখালী সম্মিলনী,
৭৯, ধীরেন ধর সরণি
কলকাতা-১২, মূল্য ঃ ২৫০ টাকা।

প্রথম আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে এদিনই ৫০ টিরও বেশি বই বিক্রি হয়ে গেছে। এদিনকার সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন নোয়াখালী সম্মিলনীর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মনোজ রায়ভৌমিক এবং সভা পরিচালনা করেন গিরিরাজ গিরিকিশোর রায়চৌধুরী।

প্রকাশিত হবে ১৮ এপ্রিল, '১১
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ১৮ এপ্রিল, '১১

নববর্ষ সংখ্যা - ১৪১৮

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবার পূর্বে 'পরমহংসমশাই', উপহাসবাদীরা বলতো 'গ্রেটওক্স'। আর হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাবার পর তিনি হলেন 'ঠাকুর'। স্বামীজীর কথায় 'অবতারবরিষ্ঠ'। ঠাকুরের লীলায় বেদান্তদর্শন উপস্থাপিত হলো অন্য ব্যাখ্যায়। গৃহী আর ত্যাগী — এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত হলো এক অনন্য দর্শন। এই মহামানবের ১৭৫তম জন্মজয়ন্তীর অবসরে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

লিখেছেন ঃ– স্বামী আত্মবোধানন্দ, হরিপদ ভৌমিক, সঞ্জয় ভুঁইয়া বিনায়ক সেনগুপ্ত, অমিতাভ গুহঠাকুরতা প্রমুখ।

।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ দশ টাকা।।
আগামী ২ এপ্রিলের মধ্যে কপি বুক করুন।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ব্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রমেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স - ২২৪১৫৯১৫
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com